প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

১৪২১

প্রবাস বন্ধু
শারদীয়া সংখ্যা আশ্বিন ১৪২১
সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন)	৩

অঙ্কন

বিনীতা	(কলকাতা, ইন্ডিয়া)	২
শ্রেয়া দত্ত	(ক্লীভ্ল্যান্ড, ওহাইও)	৪
বিনীতা	(কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৪

গদ্য

স্মৃতির মণিকোঠায় প্রথম দুর্গাপূজা	দিলীপ চক্রবর্তী (অন্টারিও, ক্যানাডা)	৫
শেষ রাতের যাত্রী	শুভা আঢ্য (অস্টিন, টেক্সাস)	৭
আত্মশুদ্ধি	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন)	১১
আজ বসন্ত যে মোর দুয়ারে	হুসনে জাহান (ক্যালিফোর্নিয়া)	১৩
ফাদার্স ডে	জয়া ঘোষ (হিউস্টন)	১৫
হৃদয়	রুমকি দাশগুপ্ত (হিউস্টন)	১৬
পেটুকের সঙ্গীতপ্রেম এবং শহুরে বনফুল	শেলী শাহাবউদ্দিন (ব্লাইদ, ক্যালিফোর্নিয়া)	২১
স্টিফেন ক্রেন	অমানিতা সেন (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	২৩
পুতুল খেলা	নন্দিতা ভাটনগর (অটোয়া, ক্যানাডা)	২৯
নিজেকেই একটু পুষি	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন)	৩২
উকিলের গপ্পো	পরাশর শরমা (অ্যাটল্যান্টা, জর্জিয়া)	৩৫
বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল	শিরাজ উল হক (হিউস্টন)	৩৭
প্রেমের সেকাল ও একাল	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন)	৪০
জিঘাংসা	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক)	৪২
ঢাকা ল-৮৫৬৪	এস্. এস্. নেওয়াজ (হিউস্টন)	৪৪
এগারোর গেরো	পরম বন্দ্যোপাধ্যায় (ডেট্রয়েট, মিশিগান)	৪৭
দোষারোপ	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন)	৪৯
বিদায়	পুষ্পা সাক্সেনা (সিয়্যাট্ল্, ওয়াশিংটন্) অনুবাদ: সুজয় দত্ত (ক্লীভ্ল্যান্ড, ওহাইও)	৫০

কবিতা

চিরন্তন	মুকুল ঘোষহাজরা (স্যালাইনা,ক্যান্সাস্)	৬
জীবন নদী	ডলি ব্যানার্জী (দার্জিলিং, ইন্ডিয়া)	১০
মনসঙ্গীত (১)	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন)	১২
প্রণমি	দীনেশ দাস	১৪
চাঁদার দেশ	রঙ্গনাথ (হিউস্টন)	১৭
স্টিফেন ক্রেন-এর কিছু কবিতার অনুবাদ	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন)	২৪
দাঁড়িয়ে আছো তুমি	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন)	২৮
নবজীবন	দিলীপ চক্রবর্তী (ফোর্ট লী, নিউজার্সি)	৩১
সভ্যতার সংজ্ঞা	শিরীন নেওয়াজ স্বাতী (ডেটন, ওহাইও)	৩৩
হাফসোল	এস্. এস্. নেওয়াজ (হিউস্টন)	৩৪
বিবিক্ত দর্পণ	গীতাঞ্জলি বঙ্গ (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৩৯
তাকে বলা হ'ল না	অপর্ণা মুখার্জী দত্ত (হিউস্টন)	৪১
মনসঙ্গীত (২)	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন)	৪৬

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা আশ্বিন ১৪২১, এপ্রিল ২০১৪

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ

বাল্ব আর বীজ
শিল্পীঃ পিয়ালী সেন দাশগুপ্ত

মুদ্রণ সহযোগিতায়

শুভেন্দু চক্রবর্তী
মৃণাল চৌধুরী

সাহিত্য সভার ছবি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সহযোগিতায়

রূপছন্দা ঘোষ
চন্দ্রা দে
তৃষা বিশ্বাস
মালবিকা সেনগুপ্ত
সুভাষ দাস
ভজেন্দ্র বর্মন
অসিত কুমার সেন

সম্পাদনায়

সুজয় দত্ত
মালবিকা চ্যাটার্জী

শিল্পীঃ বিনীতা

সম্পাদকীয়

শারদীয়া ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাঙালি হৃদয় হিল্লোলিত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। যারা বাংলায় জন্মে, বাংলায় প্রতিপালিত হয়েছে তাদের কাছে পুজোর ছুটি একটা বিরাট ব্যাপার। ছুটি, বন্‌ধ্ এসব তো হামেশা লেগে আছে আমাদের জন্মভূমিতে, কিন্তু পুজোর ছুটির একটা আলাদা মাধুর্য। কেবল নতুন জামাকাপড়, জুতো বা আরো অনেক পার্থিব জিনিসপত্রের জন্য সে মহিমা নয়। সেই সময়ের প্রকৃতিও কেমনভাবে যেন আমাদের মানসিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। মন উদারতায়, খুশিতে, ভালবাসায় ভরে থাকে।

বাংলায় শিউলি, কাশফুল হ'ল শরতের চিহ্ন, নীল আকাশে 'সাদা মেঘের ভেলা'র নিচে সাদা ফুল। আর আমেরিকার প্রকৃতিতে দেখি তখন রঙের প্রাচুর্য। চারিদিক রঙের ছটায় রঞ্জিত! গাছের পাতারই কতরকম বাহার। রঙের সেই মনমোহন দৃশ্যের পর নতুন ফুলে, ফলে, পল্লবে বিকশিত হবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত রংবাহারি গাছগুলো থেকে ঝরে পড়ে সব পাতা। কিন্তু যাবার আগে মানুষের মনে রেখে যায় সুন্দর এক ভালো লাগার অনুভূতি।

প্রকৃতির এই ক্রমপরিবর্তিত রূপ আমাদের মনে আগামী ঋতু সম্পর্কে সচেতনতা জাগায়। শরৎ কাল সকল জীবের কাছেই অভিপ্রেত, কারণ না ঠান্ডা, না গরম এই আবহাওয়ায় নানারকম সুস্বাদু শাক-সবজি, ফলমূল, শস্য উৎপন্ন হয়। নতুন ধানের চাল, নতুন ফল, সবজি, খেজুর গুড় মিলিয়ে নবান্নের চল ছিল আমাদের ছোটবেলায়।

শরৎ আর হেমন্ত দুটো ঋতু মোটামুটি একই রকমের। কবে থেকে শরৎ শুরু আর কবে শেষ বলা কঠিন, কারণ বিভিন্ন দেশের ঋতু বিভাজন নির্ভর করে তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর। তাই সব দেশের শরৎ কাল একই সময় শুরু হয় না, তবে কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই পড়ে। দিন কমে আসে রাত বাড়ে।

আমরা আনন্দিত চিত্তে আহ্বান জানাই শরৎ প্রকৃতিকে।

পত্রিকার কাজে আমাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, যাঁরা লিখেছেন, যাঁরা ছবি এঁকেছেন
তাঁদের সকলের কাছে রাখি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শারদীয়া অভিনন্দন জানাই-
মালবিকা চ্যাটার্জী

শিল্পীঃ শ্রেয়া দত্ত

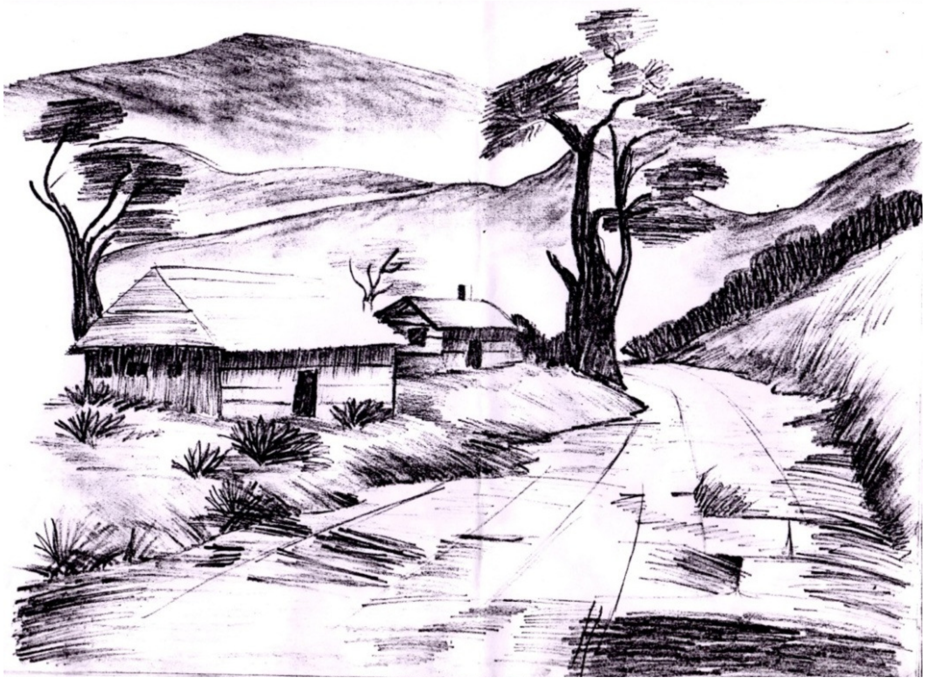

শিল্পীঃ বিনীতা

স্মৃতির মণিকোঠায় প্রথম দুর্গাপূজা

দিলীপ চক্রবর্তী

Journey down memory lane... স্মৃতি হাতড়ে পিছনের দিকে এগোনো। ইংরেজ কবি টি. এস্. এলিয়ট্ যেই অর্থে বলেছেন 'Modern man is progressively advancing backward', সেই অর্থে নয়। বরং অনেকটা যেই অর্থে কলকাতার মিনিবাসের কন্ডাক্টর যাত্রীদের বলেন 'পিছনের দিকে এগিয়ে যান', সেই অর্থে। আমরা জানি 'অতীতের অভিজ্ঞতায়, বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার নাম জীবন'। কিন্তু অনেক বাংলাদেশী বাস্তুহারাদের মতো আমারও 'অতীত পদ্মাগর্ভে বিলীন, বর্তমান কুয়াশাচ্ছন্ন আর ভবিষ্যৎ অন্ধকার'। তবু আশায় বুক বেঁধে এগিয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, 'There is always light at the end of the tunnel.'

আমার জীবনের প্রথম দুর্গাপূজার স্মৃতি ১৯৪৪ সালে গাইবান্ধায়, আমার মোটাদাদুর বাড়ীতে। আমার মায়ের রোগা বাবাকে আমি কেন 'মোটাদাদু' ডাকতাম, জানি না। ভূমিকারও আবার একটা ভূমিকা থাকে। আগে সেটাই সেরে নিই। আমার জন্ম বাংলা ১৩৪৪ সনের ১৯শে ভাদ্র (শনিবার, অমাবস্যা), অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৩৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি শিক্ষাবিদ্, দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন বলে এই দিনটা ভারতে শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়। গণৎকাররা আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন যে আমি অসাধারণ হব... ভাল হলে খুব বিখ্যাত আর খারাপ হলে ডাকাতের সর্দার। সেই গণৎকারদের পেলে এখন জানতে চাইতাম যে আমার মতো এমন নির্বিষ হেলে সাপকে নিয়ে তাঁরা এইরকম রসিকতা কেন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পূজনীয় রামঠাকুর (উনি দূর সম্পর্কে আমার দাদু) আমাকে কোলে নিয়ে 'বালগোপাল' বলে ডেকেছিলেন। তাই আমার নাম গোপাল রাখা হয়েছিল।

আমার দেশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। অনেকে ছড়া কেটে বলত 'বিদ্যা, বদবুদ্ধি, টাকা, তিন নিয়ে ঢাকা'। আমার জন্ম মাদারীপুরে, আমার আর এক দাদু ডাঃ পরেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে। সেই জায়গা নিয়েও ছড়া শুনতাম, 'হড়, হাড়ি, খেজুরি গুড়, তিন নিয়ে মাদারীপুর'। মাদারীপুরের কাছে বাহিতপুর, যেখানে জন্মেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ গুরুমহারাজ প্রণবানন্দ স্বামীজী। আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে গাইবান্ধায় মোটাদাদু ডাঃ অমৃতলাল উকিলের বাড়ীতে... 'বাহের দেশের সব ধান্ধা, রংপুরের গাইবান্ধা'। ছোটবেলায় আমি যাঁকে খুব ভালবাসতাম এবং যাঁর সাথে থাকতাম তিনি আমার মায়ের দাদু। শুনেছি আমি তাঁর চোখের মণি ছিলাম। ১৯২৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় ওঁর মাসিক বেতন ছিল ৪০০ টাকা। ঐ সময়ের হিসেবে বিশাল টাকা। দাদুর জন্য আমার ছোটবেলা খুব আনন্দে কেটেছে। আমাকে মারা তো দূরের কথা, কেউ বকতও না। যদিও তখন বাড়ীতে এবং স্কুলে মার খাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। একটা ছড়াই তো ছিল... 'ঠিক কথা বলেছেন নবনীতা সরকার, ছেলেদের মাঝেসাঝে মারধোর দরকার'।

সমবয়সীদের মধ্যে আমিই প্রথম 'ইংরেজী প্যান্ট' পরতাম (দড়ি ভরা প্যান্টকে বলতাম 'বাংলা প্যান্ট' আর বোতাম দেওয়া প্যান্টকে 'ইংরেজী প্যান্ট')। 'ফাউন্টার পেন্ও' আমিই ব্যবহার করেছি প্রথম (fountain pen কে আমরা তাই বলতাম)। আমার দাদুর গানের গলা ছিলে অপূর্ব। দাদু কিছুদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। কবিগুরু দাদুকে 'বাঙাল' বলে খ্যাপাতেন মাঝে মাঝে। সেই গানের গলা পেয়েছিল আমার মা আর মায়ের বোন মীরা। সঙ্গীত বিদ্যায় আমি ছিলাম 'অসুর'। আমার মায়ের গানের এমন খ্যাতি ছিল যে একবার এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আমার মা গাইবেন জেনে উদ্যোক্তারা আগেই প্রথম পুরস্কারের কাপে মায়ের নাম খোদাই করে দিয়েছিল, যা নিয়ে পরে অশান্তি হয়েছিল। মীরামাসী নাচতও চমৎকার। গাইবান্ধার পানুদার (স্বাধীন ভারতের নামকরা নৃত্যশিল্পী শ্রী পানু পাল) সাথে মীরামাসীর দ্বৈতনৃত্য (আমি বলতাম 'দৈত্যনৃত্য') 'অসুরবধ' ছিল অসাধারণ।

এখানে দুটো মজার ঘটনা মনে পড়ছে। মীরাকে আমি 'মীরামাসী' ডাকতাম, কিন্তু ওঁর ছোট ভাইবোনেরা ওঁকে 'চিনিদি' বলে ডাকত। আমিও যাতে 'মীরামাসী' না ডেকে 'চিনিমাসী' ডাকি, সেজন্য মীরামাসী আমাকে অনেক চিনি খাওয়াত। আমি অবশ্য গোঁয়ার্তুমি করে ওঁকে ডাকতাম 'মিরচিমাসী', (মীরার 'মীর' আর চিনির 'চি' মিলিয়ে)... অবশ্যই আড়ালে। মিরচিমাসী বলার আরো একটা কারণ ছিল। মীরামাসী মাঝে মাঝে খুব অন্যায় করত- আমার পড়া ধরত। দ্বিতীয় স্মৃতি আমার বড়মামা অমূল্যকে নিয়ে। ওঁর খুব রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার শখ ছিল। কিন্তু কাঠ বাঙালের ভাষা অভিনেতা ভানু ব্যানার্জীর নবীন সংস্করণ। 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত! কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো।'... এই লাইন দুটো অমূল্যমামার ভাষায় দাঁড়াত 'ক্যান চক্ষুর জলে ভিজাইয়া দিলাম না হুকনা মাটী যত? কে জানত আইবা তুমি গো হাবাইত্যার মতো?'

দাদু এবং ওনার স্ত্রী ছিলেন 'মেড্ ফর ইচ্ আদার'... ধর্মে, কর্মে এবং নামে। দাদুর নাম 'হেম', ওঁর স্ত্রীর নাম 'হিরণ্ময়ী'। দাদুর দুই মেয়ে। বড়মেয়ে ফরসা, নাম ধবলী (যেটা পরে 'দলি' হয়ে যায়)। ছোটমেয়ের নাম আকালী। এত সুন্দর মহিলার নাম আকালী কেন, বুঝতে পারতাম না। পরে জেনেছি যে, ওনার জন্মের বছর দেশে আকাল পড়েছিল। চালের মণ পাঁচ টাকা হয়েছিল। তাই নাম দেওয়া হয়েছিল আকালী। অনেকের জীবনে শাপে বর (ব্লেসিং ইন্ ডিস্গাইস্) হয়, আমাদের হয়েছিল উল্টো। দাদুর প্রখর ইংরেজী জ্ঞানের ফলে আমাদের ডিক্শনারী দেখার অভ্যাস ছিল না কোনদিন।

কথায় বলে 'খাজনার চেয়ে বাজনা ভারী'। স্মৃতিচারণ করতে বসেছি প্রথম দুর্গাপূজার, ভূমিকা লিখতেই রাত কাবার। পূজা হয়েছিল গাইবান্ধার কালীবাড়ীতে। পূজার স্মৃতি বিশেষ অবশিষ্ট নেই। শুধু মনে আছে আমার মেজমামা আমাকে সাইকেল থেকে ফেলে দিয়েছিলেন। বাজনা বাজছিল, কয়েকজন নাচছিল, কলাপাতায় প্রসাদ খেয়েছিলাম। একটু পায়েস মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। মা দুর্গার প্রসাদ ফেললে পাপ হবে, তাই তাড়াতাড়ি সেটা তুলে খেয়েছিলাম। যদিও তাতে পায়েসের চেয়ে মাটিই বেশী ছিল। মা দুর্গার দশ হাত

দেখে ভেবেছিলাম উনি কাত হয়ে কীভাবে ঘুমোতেন! একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'বোকার মতো কথা বোলো না'। ভয়ে চুপ করে গেলাম। আর কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু মনে হয় ঠাকুরমশায় আমার প্রশ্ন শুনেছিলেন। উনি নিজে এগিয়ে এসে বললেন, 'মা দুর্গা দশ হাত দিয়ে দশদিক সামলান'। আমি মনে মনে ভাবলাম দশ দিক আবার কোথায়! দিক তো চারটে... উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম। ভয়ে আর কিছু বলিনি।

পূজার কয়েকদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ভাসানের পর কেঁদেছিলাম। আমার এই আবেগের কারণ মনে হয় আমি অবচেতন মনে মা দুর্গার সাথে আমার নিজের মাকে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। আমি মামাবাড়ীতে থাকতাম। আমার মা আমার বাবার চাকরির জায়গায় থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন বাপের বাড়ী... মা দুর্গার মতো। আজ সাতাত্তর বছর বয়সে আমার মনে হয় বাল্যকালের সেই ভুল আমার জীবনের পরম সত্য। আমার স্বর্গবাসী মা আমার জীবনে মা ভগবতীরই প্রত্যক্ষ রূপ। এইরকম অনুভূতি নিজেদের মায়েদের সম্বন্ধে অনেকেরই আছে। 'মা' নামের এমনই মহিমা, সম্পর্কের সাথে 'মা' যোগ করলে সেটা অন্য মাত্রা পায়... ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা, মাসীমা, কাকীমা, জেঠিমা, দুর্গা-মা ...!

চিরন্তন
মুকুল ঘোষহাজরা

হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় -
দুলতে দুলতে নেমে আসে ঝরাপাতার দল!
প্রজাপতির পাখার রং নিয়ে, নীল আকাশের বুক থেকে
ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে নামে তারা!
ঝরে পড়ে কখনও বা ঝর ঝর ঝর্ণাধারার মতো!
অধীর আগ্রহে যেন প্রতীক্ষায় রত।
অনাদৃত, বর্ণহীন রুক্ষ তরুতল,
কোমল প্রাণের স্পর্শে ঝরাপাতার দল
বর্ণে বর্ণে ভ'রে দেয় শূন্য বৃক্ষতল।
জীবনের শেষ প্রান্তে ঝরে পড়া পাতা
নিঃশেষে শেষ সে তো হয় না কখনো!
নবীনের আগমনে, নূতনের ডাকে,
পুরানো যা ছিল কিছু, জীবন খাতায়
মুছে সে তো যায় না গো, হারায় না তাকে,
শুধু সঞ্চিত হয় তারা স্মৃতির পাতায়!
যবে একান্তে আপন মনে বসি নিরজনে,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে আপনার মনে!
ফিরে পাই আমি তারে চিত্ত মাঝারে!
সুপ্ত রয়েছে যে বিস্মৃত আঁধারে!
হারাইনি আমি তারে, বুঝি সেই ক্ষণে
চিরতরে বাঁধা সে যে স্মৃতির বাসরে।

শেষ রাতের যাত্রী

শুভা আঢ্য

নিউ ইয়র্ক শহরে ট্যাক্সি চালকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হওয়া খুব আশ্চর্য কিছু নয়। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই বিশাল জনপদের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ট্যাক্সি নিয়ে দিন রাত্রির সময়ে অসময়ে যাত্রী পারাপার করবার ধান্দায় কত কিছুই জানা হ'ল, দেখা হ'ল। সাধারণ নিরীহ নাগরিক থেকে ইন্টারপোলের খাতার পাতায় নাম ওঠা দুর্ধর্ষ আসামী, ঘর পালানো কিশোরীর থেকে জেল পালানো কয়েদী, ম্যানহ্যাটেনের পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দার থেকে আমেরিকার মাটিতে সদ্য পা দেওয়া বিভ্রান্ত রিফিউজি অনেকেরই পদচিহ্ন পড়েছে এই ক্যাবের মধ্যে। 5th Avenue-র দামী স্যুট্ পরিহিত ধনী, শতচ্ছিন্ন জামা জুতো পরনে homeless, পুরু চশমা চোখে ভুলো প্রফেসর, আর উৎকট প্রসাধনে সজ্জিত বারবনিতা সবারই প্রয়োজনে সাড়া দেবার জন্যে আমি আছি। ডাকলে যেতেই হয়। কেউ ন্যায্য পাওনা দিয়ে যায়, কেউ মনের খুশিতে বেশিও দেয়, আবার বন্দুকের নল দেখিয়েও কেউ কেউ সওদা করে বিনি পয়সার যাত্রী হতে। Rear view mirror দিয়ে দেখতে পাই কখনো তরুণ প্রেমের প্রথম অঙ্গীকার, কিংবা কোনো অজানা দুঃখের জোয়ারে ভেসে যাওয়া নীরব অশ্রুবন্যা। কানে আসে শিশুর কলকাকলি, কৈশোরের বাঁধভাঙা আনন্দের উল্লাস, মাতালের উন্মত্ত চীৎকার।

যাত্রীকে এক ঠিকানা থেকে আরেক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। তাদের কি উদ্দেশ্য, কি পরিণতি তা জানার সময় বা ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার কাজের তালিকায় লেখা নেই। কাজের ফেরে মিনিটগুলো ঘন্টায়, ঘন্টাগুলো দিনে, দিনগুলো বছরের পাতায় মিলিয়ে যেতে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল তাদের personal agenda নিয়ে আসে আর যায়, কেন, কি কারণে, সে খবরে আমার কাজ কি? তবুও হয়ত কখনো কোনো একটি মুখ, একজন যাত্রী বা কোনো ঘটনা মনে দাগ কেটে যায়। কিছুদিন মনে থাকে, তারপর কাজের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেয়ে কোথায় হারিয়ে যায় আবার।

কাজে আজ কিছু ব্যস্ততার ঘাটতি। যাত্রীর অপেক্ষায় সেন্ট্রাল পার্কের পাশ ঘেঁষে বসে থাকতে থাকতে বিনা কারণেই তেমনি একজন মানুষের ছবি ভেসে উঠেছে মনের অ্যালব্যামের হলদে হয়ে যাওয়া পাতায়। সেই মানুষটিকে মনে রাখার কোনো বিশেষ কারণ বা প্রচেষ্টা ছিল না। ভেবেচিন্তে খুঁজতে গেলে হয়ত পাওয়াই যেত না। কারণ মানুষটি নিতান্তই সাধারণ। ট্যাক্সি চালকদের মনে থাকবার মতো না ছিল তাঁর বেশবাস, না তিনি দিয়েছিলেন মোটা অঙ্কের বকশিশ। নাম ধাম কিছুই জানা হয়নি, শুধু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের ছোট একটি অনুরোধ প্রথমে আমাকে বেশ কিছুটা অবাক করেছিল। কিন্তু নির্দেশ মেনে গাড়ি চালানোই আমার কাজ তাই কোনো কৌতূহল প্রকাশ করার কথা মনেও আসেনি।

কতদিন আগেকার কথা, তবু মনে হয় এই তো সেদিন। আসন্ন শীতের মরশুম, কিন্তু সে রাতে কালো আকাশে মেঘ ছিল না, হাওয়ার গতিবেগ মৃদু। নিউ ইয়র্কের রূঢ় আলোর ঝলমলানির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি কালো আকাশে ছড়িয়ে থাকা তারার মেলা। সেদিন আমার ছিল রাতের শিফ্ট্-এ কাজ। রাতের কাজে, যেমন বেশি টিপ্সের আশা থাকে, তেমনি থাকে বিপদের আশঙ্কা। কাজেই সেই সময়ের কাজের ভার বেশিরভাগ পড়ত আমার মত অল্প বয়সের, অল্প অভিজ্ঞ চালকদের ওপর, যাদের টাকার প্রয়োজন নিজস্ব সুরক্ষার চেয়ে অনেক বেশি। তাই ট্যাক্সি কম্পানির নির্দেশমত ঠিকানায় যখন পৌঁছালাম তখন আমার ঘড়িতে রাত দুটো বেজে তিরিশ মিনিট। ম্যানহ্যাটেনের আকাশচুম্বী কোন হোটেল বা বহুতল মঞ্জিলের সুবেশ দ্বারী-সুরক্ষিত, উদ্ধত আলো পিছলানো ঝকঝকে কাঁচের প্রবেশ পথে নয়, কিন্তু তাদের পিছনে ফেলে রেখে এক অতি সাধারণ নামহীন পাড়ায় একটি দোতলা বাড়ির রংচটা কাঠের দরজায় এসে মনটা যে একটু শঙ্কিত হয়নি তা নয়। এ সব জায়গা থেকে এমন সময়ে ট্যাক্সি ডেকে পাঠায় যে যাত্রীরা, তাদের নামগোত্র খুঁজতে হলে পুলিশের খাতায় উঁকি দিতে হতে পারে। আর মোটা টিপস্ পাওয়ার আশা?- না করাই ভালো, শেষমেষ ভাড়া জুটবে কিনা কে জানে? প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারা গেলেই অনেক পাওয়া হবে।

সামনের ছোট জানালার কাঁচের পিছনে ক্ষীণ একটি আলো ছাড়া বাড়িটি অন্ধকার। একবার মনে হ'ল এক দু'বার হর্ন বাজিয়ে দেখি, কেউ না বেরোলে একটু থেমে চলে গেলেই হবে। আবার মনে হ'ল হয়ত কেউ অপারগ বা অসুস্থ মানুষও তো হতে পারে। তাদের কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন থাকতে পারে। কি ভেবে ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজায় গিয়ে বেল বাজালাম। ভেতরে মনে হ'ল হালকা আওয়াজ পাওয়া গেল, কেউ যেন স্খলিত ধীর পায়ে হেঁটে আসছে দরজার দিকে। সাবধান থাকা ভালো ভেবে মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে একপাশে একটু সরে দাঁড়ালাম। দরজা খুললেন এক সামান্য নুয়ে পড়া অশীতিপর বৃদ্ধা। ঘরের অল্প আলোয় দেখতে পেলাম, বৃদ্ধার পরনে হাঁটু দৈর্ঘের জামা, তার ওপরে নীল কোট। মাথায় হ্যাট, যেমন দেখা যেত ১৯৪০ সালের ছায়াছবিতে। অল্প আলোতেও মনে হ'ল পরনের পোশাকগুলোরও বৃদ্ধার মতই বয়েস হবে। মহিলা আমাকে তাঁর পাশে রাখা একটি ছোট কালো রঙের স্যুটকেস্ দেখিয়ে বললেন- 'এটা আমার সঙ্গে যাবে।' আমি তুলে নেবার জন্য হাত বাড়াতে একটু কিন্তু হয়ে বললেন, 'হালকা,... আমি বোধহয় পারব।' উত্তরে বললাম, 'ব্যস্ত হবেন না, আমি নিচ্ছি আপনি আসুন।' আমার দিকে ঝাপসা চশমা পরা কৃতার্থ দুটি চোখ তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'you are so kind!' স্যুটকেস্টা তুলে নেবার সময়ে ঘরের মৃদু আলোয় দেখতে পেলাম প্রায় শূন্য ঘরের সামান্য আসবাবগুলি সাদা চাদরে ঢাকা, কাঠের মেঝেতে কোনো কার্পেটের চিহ্ন নেই, দেওয়ালে নেই কোনো ছবি, এমনকি একটা ঘড়িও নেই। ঘরের এক কোণে মনে হ'ল একটা কার্ড বোর্ডের বাক্সের ভেতরে কিছু ছবির ফ্রেম ঢোকানো আছে। বোবা এক বিষণ্ণতা মূর্ত হয়ে রয়েছে এখানে। যেন এখানে আর কেউ ফিরবে না, অন্তত খুব শিগগির তো নয়ই। মহিলা এবার পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। মনে হ'ল যেন

হালকা একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের সুইচ্ নিভিয়ে দিতেই একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে, তারপর তিনি ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিতে একটা ছোট্ট ক্লিক শব্দে বোঝা গেল দরজাটি lock হয়ে গেছে। আমি এক হাতে স্যুটকেস্ নিয়ে অন্য হাতটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। পাখির মত হালকা হাতটি বাইরের শীতের রাতের মতই ঠান্ডা। ধীরে ধীরে আমার হাতটি ধরে তিনি ট্যাক্সির দিকে এগোলেন। আমাকে বারে বারে ধন্যবাদ দেওয়াতে আমি বললাম- ‘এ তেমন কিছুই নয়। আমি আপনার জন্য যা করছি আশাকরি আমার মায়ের যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেদিন তিনি যেন এমনি করেই কারো সাহায্য পান।’ বৃদ্ধা আমার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললেন, ‘you are a good man.’ মনে হ’ল সহজ সরল এই কথাগুলি তাঁর অন্তরের কথা, মন রাখা কথা নয়।

ট্যাক্সিতে উঠে আমাকে একটি কাগজের টুকরোতে তাঁর গন্তব্য-স্থানের ঠিকানাটা দিয়ে বললেন- ‘Son, তুমি আমাকে down town এর ভেতর দিয়ে নিয়ে চলো, please!’ চমকে উঠে বললাম- ‘কিন্তু সে তো অনেক ঘুরে যেতে হবে, সে রাস্তা তো সোজা রাস্তা নয়, আর ভাড়া... !’ বৃদ্ধার উত্তর কানে এল- ‘ওহ, তাতে আমার কোন সমস্যা নেই। আসলে তাড়া করবার কোন কারণও নেই। আমি যাচ্ছি এক জায়গায় যেখান থেকে আর ফিরতে হবে না। তারা কাল সকালের আগে খুলবেও না।’ Rear view mirror-এ দেখে মনে হ’ল নিষ্প্রভ দুটি চোখের মধ্যে যেন অনেক দিনের প্রায় শুকিয়ে আসা এক অশ্রুনদী বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু শান্ত এই মানুষটি তাকে মেনে নিয়েছেন, উদ্বেল হয়ে উঠতে দিয়ে কোনো লাভ নেই ভেবেই বোধহয়। তিনি বললেন- ‘আমার কাছের মানুষরা আর কেউই নেই, এক আমিই আছি। কিছুদিন আগে জানতে পারলাম আমার ক্যান্সার রোগেরও আর কোন চিকিৎসা নেই। আমার ডাক্তারটি, তোমারই মতো বড় ভালো মানুষ। সে আমার জন্যে এক হস্‌পিস্-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে যেখানে আমি আর যে কটা দিন বাঁচি, থাকতে পারব। ‘‘হস্‌পিস্’’ কি আমার জানা ছিল না। আমার চুপ করে থাকার মধ্যে যেন প্রশ্নের আভাস পেয়ে নিজেই বললেন- ‘Hospice is for terminal patients, they will keep me comfortable till it is time for me to go…’ বলার মধ্যে কোনো আবেগের আধিক্য নেই, যেন বাস্তবতার এক সাধারণ বিবৃতি। মনের চঞ্চলতাকে দমন করে, জিজ্ঞাসা করলাম- ‘বলুন কোন রাস্তা দিয়ে যাব?’ হাত বাড়িয়ে আমি নিঃশব্দে আমার মিটারটা বন্ধ করে দিলাম।

পরের কয়েক ঘন্টা আমরা যে পথ ধরে যাত্রা করলাম সেটি তাঁর স্মৃতিচারণের পথ। কোন এক বিগত বসন্তের দিনে তিনি তাঁর স্বামীর হাত ধরে প্রথম ভালবাসায় ভরা জীবন শুরু করেছিলেন- সেই ছোট্ট বাড়িটার সামনে দিয়ে, তাঁর প্রথম কাজের অফিস এর পাশ দিয়ে, যেখানে তিনি টেলিফোন operator-এর কাজ করতেন। যে স্কুলে তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়ে, তিন বছরের মার্থাকে ছাড়তে এসে মেয়ের চেয়ে বেশী কেঁদেছিলেন। মার্থার স্কুলের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন যে মার্থা চকলেট্ ডোনাট্ খেতে খুব ভালবাসত। তিনি একাই কথা বলে চলেছেন, তাই সঙ্গ দিতে জিজ্ঞেস করলাম- ‘মার্থা এখন কোথায়?’ একটু চুপ করে থেকে বললেন, She was a waitress at the World Trade Center's famous top floor restaurant.’ সেই ভয়ঙ্কর দিনে সমস্ত পৃথিবী এক মুহূর্তে অসীম যন্ত্রণায় মূক হয়ে গিয়েছিল, তার খবর কে না জানে? এক অসহায় মায়ের বুকে সেদিনের ঘটনা যে কী আঘাত হেনে গেছে তা ভেবেই আমার মন দুঃখে, ক্ষোভে, অস্থির হয়ে উঠছিল। রাতের অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু সেই বেদনার্ত মুখ আমি মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা আমার জানা ছিল না তাই শুধু অসহায়ের মতো বলে উঠলাম- ‘I am so sorry!’ তিনি বললেন- ‘Me too, me too!’

আবার শুরু হ’ল চলা। রাস্তার ঝাপসা আলোয় লোহার shutter-এ আলো ছেটানো ছোট একটি ফার্নিচারের দোকানের কাছে এসে একটু যেন চিন্তায় পড়লেন। তারপর বললেন- ‘এখানে আগে একটা dance hall ছিল। এখানেই আমার স্বামীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল।’ কিছুটা নিজের মনে মনেই বলতে থাকলেন- ‘আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছুদিন পরেই John যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। আমার তখন মাত্র পনের বছর বয়স। সে বলে গিয়েছিল অপেক্ষা করতে। আমি করেছিলাম, সে না বললেও আমি করতাম! তারপর এখানেই ছোট্ট এক church-এ আমাদের বিয়ে হয়। নিউ ইয়র্ক এখন কত বদলে গেছে। সে চার্চ আর এখন নেই, just some faded memories…!’ কথা শুনতে শুনতে এই শীর্ণ জীর্ণ মানুষটিকে আড়াল করে আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল সেদিনের একটি অল্প বয়সী মেয়ের ছবি, এক অল্প চেনা তরুণের বাড়ানো হাতের দিকে হাত বাড়াতে যার মনে কিছু শিহরণ, কিছু ভয়, কিছু দুঃসাহস। যার পঞ্চদশী চোখে ছিল আগামী দিনের সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বপ্ন।

আমার ট্যাক্সি চলতে থাকল নানান রাস্তা ধরে। বৃদ্ধা কখনো আমাকে আস্তে চালাতে বলেন কোন একটি বাড়ির সামনে বা পথের বাঁকে, কখনো বা নিঃশব্দে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন, হয়ত কোনো কথা তাঁর মনে পড়ে যায় কিংবা কোনো ভুলে থাকা, পিছনে ফেলে আসা জীবনের এক টুকরো তাঁকে ডাক দিয়ে বলে, দেখো তো আমাকে তুমি চিনতে পার কিনা? আমি কোনো প্রশ্ন করি না, পাছে এই স্বপ্নমগ্ন মানুষটির স্বপ্নে বাধা পড়ে, আর তাঁকে আবার নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। মনে মনে ভাবি, আহা, থাকুন না মানুষটি রাতের এই গভীরতার আড়ালে, হাত দিয়ে যা ছোঁয়া যায় না, মন দিয়ে সেই ছোট ছোট স্মৃতিগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে থাকুন। এতে তো পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি আমাকে একটি হাসপাতালের নাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেটি আমার চেনা কিনা। সে হাসপাতাল আমরা বেশ কিছুক্ষণ আগে পিছনে ফেলে এসেছি। বুঝলাম তিনি বহুদিন বাড়ির কাছাকাছি ছাড়া ম্যানহ্যাটেনের পথে বার হননি। আবার মোড় ঘুরে ফিরে চললাম সেই হাসপাতালটির দিকে। হাসপাতালটি বিশ্ব-বিখ্যাত Sloan Kettering Cancer Center, যেখানে পৃথিবীর বহু কোণ থেকে দুরারোগ্য রোগ পীড়িত

মানুষ আসে আরোগ্যের আশা নিয়ে। এখানে দিবারাত্রি চলছে মানুষের সঙ্গে মহাকালের সংগ্রাম। এত রাত্রেও বিশাল হাসপালটিতে গাড়ি ও মানুষের যাওয়া আসা দেখা যাচ্ছে, চারিদিক আলোয় আলোয় দিন হয়ে আছে।
'একটু থামা যাবে কি এখানে?' শ্রান্ত অনুরোধ। ব্যস্ত পথ থেকে সরে গিয়ে একটু নিরালা খুঁজে থামি। বৃদ্ধা ঘোলাটে চোখ মেলে একদৃষ্টে বাড়িটির দিকে চেয়ে থাকেন। কিসের টানে? আমি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, তাঁর মগ্নতায় যাতে কোনও বাধা না পড়ে সেইজন্য। শীতের হাওয়া ছুঁয়ে যায় চোখে মুখে। নিউ ইয়র্ক কখনো ঘুমোয় না, প্রতিটি পলে সে চোখ মেলে দেখতে থাকে জীবনের উঠানামা। তার বুকের ওপরে রচনা হয় কত মানুষের কাহিনী, সে শুধু নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে। কোনদিন মনে হয়নি, কিন্তু আজ কেন জানি না কেবলই মনে হতে লাগল, এ শহর যদি কথা বলতে পারত তাহলে বুঝি আকাশ, পৃথিবী তার কাহিনীতে উপছে উঠত।

শীতে শরীর শিউরে উঠতে গাড়িতে গিয়ে বসে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি আমার যাত্রী তখনও একদৃষ্টে হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে বসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- 'Are you wondering why I came here?' আমি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই বলে উঠলেন- 'I lost my John in this place, just before Martha.' তাঁর ক্লান্ত স্বর নীরবতায় মিলিয়ে গেল।

নিজের ভাবনায় কখন ডুবে গিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি সামনে আকাশের দিকে সীমায় রাঙা আলোর প্রথম রেখা। আমার নীরব যাত্রীটিও এই সময়ে বলে উঠলেন- 'আমি বড় ক্লান্ত, এবার আমাকে নিয়ে চলো আমার শেষ ঠিকানায়।' গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চললাম চিরকুটে লেখা সেই ঠিকানায়, যা আমাকে বৃদ্ধা যাত্রার শুরুতেই দিয়েছিলেন। চলতে চলতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম আমরা, বেশ কিছুটা সময় লাগল সেখানে পৌঁছাতে। বৃদ্ধা এই সময় সিটের ওপর মাথাটি নামিয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন, কোনও কথা বলার প্রয়াস করেননি। এক পলক দেখে মনে হ'ল যেন জীবনের খেলার শেষে শ্রান্ত হয়ে শিশুর মতো পরম নির্ভরতায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন সেই সর্ব ক্লান্তিহরা ঘুমের কোলে। অকারণেই আমার চোখ সিক্ত হয়ে উঠেছিল এক পরম মমতায়।

ঠিকানা মিলিয়ে লাল ইঁটের তিনতলা বাড়িটির সামনে যখন পৌঁছালাম তখন ভোরের আকাশে সূর্যের আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িটি দেখলে মনে হয় এককালে এটা হয়ত কারো বাসস্থান ছিল, এখন একটি বৃদ্ধাবাস-এ রূপান্তরিত হয়েছে। কালো রংয়ের দরজার ওপরে পেতলের ফলকে লেখা 'Abode of Peace'। আমি ট্যাক্সি থামিয়ে বৃদ্ধাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দরজার বেল টিপলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে বৃদ্ধাকে কিছু বললেন, তারপর ফিরে এসে আমাকে বললেন- 'Will you kindly get her belongings and set on the porch?' আমি স্যুটকেস্টি এনে দরজার কাছে রাখবার আগেই একজন নার্স একটি wheel chair এনে সযত্নে বৃদ্ধাকে তাতে বসিয়ে দিলেন। বৃদ্ধাকে দিনের আলোয় দেখে বুঝলাম তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর মুখে চোখে অসীম ক্লান্তির ছায়া। মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর শেষ জীবনী শক্তিটি দিয়ে গত রাতের পর্যটনটি সমাপ্ত করেছেন। এবারে তাঁর মন, প্রাণ, দেহ যেন শেষ আশ্রয় খুঁজছে, চাইছে সব ক্লান্তিকে এক সমাপ্তির মধ্যে হারিয়ে ফেলতে।

বৃদ্ধা আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বললেন- 'Tell me how much I owe you.' বললাম- 'Please do not worry, I am okay.' তিনি বলে উঠলেন, 'But you have to make a living!' উত্তরে জানলাম, 'তার জন্য অন্য যাত্রী আছে, Please let me do this.' তারপর কি জানি কেন আমি নিচু হয়ে আমার দু হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, আর তিনিও আমাকে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আমি শুনতে পেলাম রাতে ওড়া পাখির ডানার শব্দের মত মৃদু তাঁর স্বর, তিনি বলছেন- 'You gave an old woman a gift of joy, bless you my son!' আমার দু চোখের শোক ও আনন্দের অশ্রু বুঝি তাঁর কাঁধেও ঝরে পড়ল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর নিষ্প্রভ চোখেও ভোরের আলোয় শিশিরের মতো টলমল করছে দুটি জলবিন্দু।

পিছনে ফিরে চলে আসার সময়ে শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। মনে হ'ল যেন একটি জীবন কাহিনীর শেষ পাতাটি কেউ বন্ধ করল, আর সেই শেষের শব্দ নীল আকাশের গভীরে মিলিয়ে গেল।

নিউ ইয়র্ক শহরে তখন প্রাণের সাড়া জেগে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ নিত্যদিনের বন্যায় ভেসে চলেছে পথে পথে। বাস, সাব্ওয়ে আর ট্যাক্সির সে সময়ে বিষম চাহিদা। কিন্তু সে দিনের কাজের শিফ্ট্-এ আর কোন যাত্রীকে তুলতে মন সায় দেয়নি। ''Not for Hire''-এর আলো ট্যাক্সির মাথায় জ্বালিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, শরীর ছিল ক্লান্ত, মন ছিল বিষণ্ন তবু থামতে পারিনি বেশ কিছুক্ষণ। সাধারণ একটি মানুষ আমার জীবনে এক রাতের আঁধারে এমন একটি স্পর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তার রেশ চিরকাল আমার মনের গভীরে থেমে ছিল, আমার অজান্তেই। গত রাতের ট্যাক্সির ফরমাস তো আসতেই পারত অন্য আর কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। কি হ'ত, সে যদি বৃদ্ধার মনের কথা না বুঝতে পেরে বিরক্ত হ'ত, আর প্রত্যাখ্যান করত সেই ছোট্ট শেষ আবেদনটিকে, কিংবা তার তাড়া থাকত অন্য কোন কারণে? আমিই তো ভেবেছিলাম দুবার হর্ন বাজিয়ে, কেউ না এলে, অপেক্ষা না করেই চলে যাব! কার অসহায় ডাক আমার মনে সাড়া তুলেছিল? কে আমাকে নিয়ে গেল ওই অন্ধকার বাড়িটির দরজার কাছে!

কিসের জন্য কার কখন ডাক পড়ে সে কথা কি আমরা এই সদা-ব্যস্ত জীবনে ভেবে দেখার সময় পাই? আমরা মনে করি আমাদের জীবনে উত্তরণের কোন এক অসাধারণ মুহূর্ত আসবে এক মহান কোনো সময়ের মোহনায়। ভুলে যাই অবিস্মরণীয় ঘটনা আসতে পারে সাধারণ এক দিনগত ঘটনার মোড়কে, যাকে দেখে মহান বলে চেনা দুষ্কর। একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা, একটুখানি সহৃদয়তা কোথায় যে কার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে কেউ কি জানে?

আজ পিছনে ফিরে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, যে কারণেই হোক, আমার জীবনে সেই নাম না জানা বৃদ্ধার সঙ্গে কাটানো রাতের কয়েকটি ঘন্টা আমাকে দিয়েছে এক অমূল্য স্মৃতি, যা আমার নিভৃত মনের মধ্যে একটি অম্লান আলোর শিখার মতো জ্বলে। সে রাতের ঘটনা, আমার মতো একজন অতি সাধারণ ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্য কি কোন অজানা শক্তির পরিকল্পনা? না শুধুই একটি ঘটনা যার কোনো কারণ নেই?

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! চমকে উঠি কর্মব্যস্ত জীবনের চেনা ডাকে। যাত্রীকে নিয়ে চলি Wall Street-এর ঠিকানায়। কে জানে এই মানুষটির জীবনেরও বিশেষ কিছু কাহিনী আছে কিনা!

(সত্য ঘটনার অবলম্বনে)

••••❋••••❋••••❋••••

জীবন নদী

ডলি ব্যানার্জী

কখনো পূব, কখনো পশ্চিম
কখনো একূল কখনো ওকূল
জোয়ার ভাঁটার ঐকতানে
‘কান্নাহাসির দোল দোলানো’
পৌষ ফাগুনে
দুকূল ছাপিয়ে নদী বয়ে চলে
কোন সুদূরের পানে।

নদী আপন বুকে বয়ে বেড়ায়
কত ভাঙাগড়া
কত রাজরাজড়ার উত্থান পতন,
অতীত ও বর্তমান ইতিহাস খ্যাত
কত বিচিত্র কাহিনীর
নীরব সাক্ষীর বাতায়ন।
নদীর এই অব্যক্ত কাহিনী
শোনে শুধু পারের খেয়ায়
বসে নিঃশব্দ রজনী।

‘নদী তুমি কোথা যাও’
ভেসে আসে আর্তস্বর,
পথহারা নদী খুঁজে ফেরে
আপন ঘর।
খেয়া পারাপারে কত লোকজন,
কত কলরব, কত গুঞ্জন;
নদী কান পেতে শোনে
হরষিত মনে
ঢেউ খেলে যায় আপন মনে।

কত শত আলোকবর্ষ ধরে
জীবন নদী বয়ে চলেছে
আপন ছন্দে, আপন তানে,
বাঁকে বাঁকে, ঘাত-প্রতিঘাতে,
ক্ষত-বিক্ষত, জীর্ণ-শীর্ণ নদী
পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয়
সাগরের পানে।

••••❋••••❋••••❋••••

আত্মশুদ্ধি

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি মিতুলের। সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতা তখনও মনের সব চিন্তা ভাবনাকে ঘিরে রেখেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়ায় মিতুল। নীচে মানুষের কর্মব্যস্ততার শেষ নেই। বাস ট্রামের হর্নের আওয়াজ, মেহনতি মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটোছুটি, দোকানে ক্রেতা বিক্রেতার দর কষাকষি, রিক্সার টুংটাং, ঘুঙুরের শব্দ, ট্যাক্সি আরোহীর সঙ্গে ড্রাইভারের বচসা, ডাবওয়ালার ডাব বিক্রির তলব, বইয়ের দোকানে দোকানদারের আকুতি, ট্র্যাফিক্ পুলিশের সঙ্গে বাস-কন্ডাক্টারের তর্ক- সব মিলিয়ে কলেজ স্ট্রীট মোড়ের এই জায়গাটা প্রাণ চঞ্চলতায় ভরপুর।

৫৭/১ কলেজ স্ট্রীট, বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী নিবাস, মহাত্মা গান্ধী রোড আর বিধান সরণীর মোড়ের কাছে, বিধান সরণীর ওপর। বেনারসী কুঠীর ঠিক ওপরেই এই প্রাইভেট্ মেস্। এখান থেকেই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম বছর কেটেছে মিতুলের। গত প্রায় দু বছর ধরে সে এখানেই থেকেছে। নীচে দুটো থাকার ঘর, রান্নাঘর, খাবার জায়গা। আর অন্য দিকটায় স্নানঘর ও শৌচাগার, ওপর তলায় সিড়িঁ দিয়ে উঠেই সামনে দুটো ঘর, ডান দিকে তিন চারটে ঘর, বাম দিকে চারটে ঘর, আর সোজা গিয়ে গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে একটা সিঙ্গল্ রুম্ যার ভেতর দিয়ে গিয়ে আর একটা ডবল্ রুম্। আসা যাওয়ার মাঝে আর দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছোট হবার জন্যই এই সিঙ্গল্ রুমটা ছিল সবার সাময়িক বাসস্থান। নতুন কেউ মেসে এলে এখানে থাকত প্রথমে, তারপর অন্য কোন ঘরে কোন বেড্ খালি হলে সেখানে স্থায়ীভাবে চলে যেত বাসিন্দারা। মেসে যারা থাকত প্রায় শতকরা আশি ভাগ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আর বাকি কুড়ি ভাগ চাকুরিজীবি। মিতুল যখন তার বাগমারির কাকার বাড়ি ছেড়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ক্লাস-মেট্ অনুপমের সন্ধান দেওয়া এই মেসে এল, তারও সাময়িক ঠাঁই মিলল এই ঘরটায়, তখন নীচের তলায় ঘর দুটোর মধ্যে ঢুকেই ডানদিকের ঘরে থাকত নির্মলদা- হাইকোর্টের উকিল, বাম দিকের ঘরে থাকত চিনুদা ও চঞ্চলদা। যতদূর মনে পড়ে দুজনেই ছিল ব্যাঙ্ক-কর্মী। আর ওপরের ঘরে যারা থাকত তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কেউ কলেজে, কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পড়ুয়া। তাদের মধ্যে ছিল অঞ্জন, উজ্জ্বল, অরিন্দম, শঙ্খ, মাইতিদা, হিরুদা, দোল, পীযূষ, অমৃতলাল, আর কয়েকজন ত্রিপুরার ছেলে। মিতুলের ঘরের মধ্যে দিয়ে ভেতরের ঘরে যে দুজন থাকত তাদের একজন ছাত্র আর অন্যজন স্কুলের শিক্ষক- মাইতিদা। সময়টা ১৯৮৭/৮৮, তাদের সবার মধ্যে অঞ্জনের সঙ্গে মিতুলের এখনও অটুট যোগাযোগ। সাময়িকভাবে সেই অস্থায়ী ঘরে মিতুল থাকলেও, যে দুবছর সে ওখানে ছিল কখনই সে আর ওই ঘর ছাড়েনি। সেই ঘরের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৯-১০ ফুট আর প্রস্থ ঢোকার দিকে সাড়ে তিন ফুট আর ভিতরের দিকটায় প্রায় ৫ ফুট। সেই অসমঞ্জস আয়তকার ঘরে একটা ৬ x৩.৫ খাট রাখার পর শুধু যাওয়া আসার পথ পড়ে থাকত। আর মাথার উপরে ঘুরত একটা পুরনো দিনের ডি. সি. ফ্যান, সেটার থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোত প্রায় সবসময়, মিতুল পরে জেনেছিল যে তার সেই ছোট্ট ঘরটা নাকি পরবর্তীকালে অন্যদের কাছে থাকার সবচেয়ে বড় দাবিদার হয়েছিল, সেই ঘরের চাহিদা পরিবর্তনে মিতুলের একটা বড় অবদান ছিল।

বেশ ভালই কাটত মিতুলের সেই ঘরটাতে। কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশিস আর কেদার প্রায় এক সপ্তাহ ছাড়াই সেখানে চলে আসত পড়াশোনা ও আড্ডার জন্য। বিদ্যাসাগর কলেজের পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রদীপ, সুব্রত, অনুপমরাও আসত সেখানে মাঝে মধ্যে। কলেজ স্ট্রীটের সেই জায়গাটায় গ্রীষ্মকালে যখন আমের আমদানি শুরু হত তখন মাস দুই তিন জায়গাটা আমূল বদলে যেত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্বাদের আমের আমদানি শুরু হত রাত্তির দশটার পর থেকে, আর বাণিজ্য চলত সারা রাত্রি ধরে। জায়গাটা দিনের বেলার থেকে আরও জম-জমাট হয়ে যেত রাত্তিরের সেই সময়টায়। কিছু কিছু চা-জলখাবারের দোকান তো খুলতই রাত্রি দশটায়, আর খোলা থাকত পরের দিন সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত। মিতুলের আরও অনেক বন্ধুই সেখানে তার কাছে এসেছে, মনে আছে আশিস কেদারের সঙ্গে রাত্রে পড়াশুনা সেরে ঘুমতে যাবার আগে একবার চা খেতে নামত রাত্রি প্রায় একটার সময়। তখনও কলেজ স্ট্রীট প্রাণের সাড়ায় ভরপুর। বেশ ভালই কাটছিল মিতুলের। নীচের চিনুদা চঞ্চলদা ছিল মিতুলের লোকাল গার্জেন। দুজনেই ছিল অরবিন্দ আশ্রমের আন্তরিক অনুসরণকারী। তাদের সঙ্গে মিতুল বেশ কয়েকবার কলেজ স্ট্রীটে কফি হাউসের পাশে অরবিন্দ আশ্রমের এক যোগ সাধন কেন্দ্রে গিয়েছে। সেই চিনুদা ও চঞ্চলদার সঙ্গে একটা আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করত মিতুল। দুজনেরই চোখে মুখে সবসময় একটা শান্ত পবিত্র ভাব ছেয়ে থাকত।

দীর্ঘ দেড় বছর এমন প্রাণবন্ত সময়ই কাটছিল মিতুলের, রান্না করত আদিত্য আর চা জলখাবার এনে দিত কালী। বেশ চলছিল। সেদিন হঠাৎই মিতুলের মনে হল যে মাথার ওপরে পাখাটা যেন একটু বেশী আওয়াজ করছে। শঙ্খর একটা হারমোনিয়াম থাকত মিতুলের ঘরে। মাঝে মধ্যে তা নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করতে বসত মিতুল। সেইরকমই একদিন হঠাৎ খেয়াল হ'ল- মাথার ওপরে পাখার ঘড়ঘড় শব্দের বৃদ্ধি। এই পাখাগুলো ভাড়াতে নেওয়া হত পাশেই এক ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের দোকান থেকে। অন্য ঘরের পাখাগুলো বদলে নেওয়া হয়েছিল আগেই, এই ঘরটা সবার অস্থায়ী বাসস্থান ছিল বলে কেউই আর বদলাবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। মিতুল ভাবল এইবার বদলে নেওয়া দরকার। শব্দটা বেশ বেড়েছে, পাখার অস্তিত্বের দাবিও বেড়েছে অনেকটা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেদিন সকালে দোকান খুলতে না খুলতেই পাখা বন্ধ করে সে দোকানে গিয়ে পাখাটা বদলে দেবার অনুরোধ করল। দোকানদারও সঙ্গে সঙ্গে রাজি- কারণ সে জানত যে একটাই ডি. সি. ফ্যান সেই মেসে বদলানো বাকি ছিল। দোকানদার বলল পরের দিন সকালেই সে লোক পাঠাবে ফ্যান বদলে দিয়ে আসার জন্য। দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে মিতুল ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে ফ্যানের সুইচ্ অন্ করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর

একটু গরম লাগতে ওপরে তাকিয়ে দেখল যে পাখাটা ঘুরছে না। সেই আওয়াজও নেই। অনেকবার সুইচ্ অন্ অফ্ করল- কিন্তু না- পাখা কোনভাবেই ঘুরছে না। লাইটের সুইচ্ অন্ করল- ঠিকই কাজ করছে। বেশ অবাক হল মিতুল, ভাবল আশ্চর্য এই তো কিছুক্ষণ আগেই সশব্দে চলছিল, কি হল হঠাৎ! ভেতরের ঘরে গিয়ে মাইতিদাদের জিজ্ঞেস করল তারা কিছু জানে কিনা। কেউই কিছু বলতে পারল না। মিতুল সুইচ্ অন্ অফ্ করে করে হাল ছেড়ে দিল- নাঃ, পাখা কিছুতেই চলছে না। মনে মনে মিতুলের একটা অন্যায় বোধ, অকৃতজ্ঞতা বোধ জেগে উঠল, ভাবতে শুরু করল- এই প্রায় দেড় বছর ধরে পাখাটা তো ভালই সার্ভিস্ দিয়েছে, শব্দ ছাড়া আর তো কোনও সমস্যাই ছিল না, বন্ধ হয়ে যাওয়া দূরে থাক। হঠাৎ করে পাখা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ততেই কি অভিমান! মিতুলের মনটা হঠাৎ বিষণ্নতায় ভরে যায়, ভাবে- সত্যিই তো, কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে না এই পাখার জন্য! সার্ভিস্ তো কম দেয়নি। ভাবতে ভাবতেই আরও কয়েকবার সুইচের পরীক্ষা করে নেয়। নাঃ, পাখা ঘুরছে না। মিতুল ভাবল তার এই অন্যায় ভাবনার শোধন হওয়া দরকার, কাজটা সে মোটেই ঠিক করেনি। কৃতজ্ঞতা বোধ কি শুধুমাত্র মানুষের প্রতিই, অথবা পোষমানা পশু-পক্ষীদের প্রতি? অথবা ফুল, ফল, ছায়া দেওয়া বৃক্ষের জন্য? আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীন এই পাখার জন্য কেন কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে না! তার থেকেও তো উপকার কম পায়নি মিতুল! এইসব ভাবতে ভাবতে মিতুলের মনের মধ্যে অন্যায় বোধটা বাড়তেই থাকল। কাউকে কিছু বলতেও পারল না। মনের মধ্যেই গুমরতে থাকল। অনেক ভেবে ঠিক করল- আত্মশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ সে সেই ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের দোকানে হাজির। মনে মনে সে ঠিকই করে নিয়েছে যে কিছুতেই আর পাখা পরিবর্তন করবে না। সেই পাখা যদি আর নাও চলে, তাহলেও সে পরিবর্তন করবে না, কোন মতেই না। মনে মনে সে পাখার কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের দোকানে গিয়ে সে বলল যে পাখা বদলানোর আর কোন দরকার নেই। দোকানদার কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে মিতুলের দিকে তাকিয়ে থাকল, কিছু বলল না। শুধু খাতায় অর্ডারের নির্দেশ কেটে দিল। অনেকটা স্বস্তি পেল মিতুল, কিছুটা হালকাও হল মনের বিষণ্ন ভাব। মনের ভিতরের অন্যায় বোধটা অনেকটা লাঘব হল, যা কিনা মিতুলকে অসম্ভব চঞ্চল করে তুলেছিল কিছুক্ষণ আগে।

ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের দোকান থেকে মিতুল সোজা ঘরে ফিরল। পাখার দিকে তাকিয়ে মনের হালকা বোধটা তাকে আরও একটু স্বস্তি দিল। লাইটের সুইচ্ অন্ করে দেখল যে লোড্ শেডিং হয়নি। একটু দ্বিধা, সংকোচের সঙ্গে পাখার সুইচ্ অন্ করল মিতুল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। পাখা আবার আগের মতই চলতে শুরু করেছে, সেই আগের ঘড়ং ঘড়ং শব্দে! একবার সুইচ্ অফ্ করে আবার অন্ করল- ঠিকই চলছে পাখা। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার সারা মন ভরে গেল। সুইচ্ অফ্ করে সে, সোজা নীচে চিনুদা ও চঞ্চলদার ঘরে গিয়ে দেখল দুজনেই ঘরে আছে। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত ঘটনাটা ওদের জানালো মিতুল। দুজনেই একটু মুচকি হাসল আর মিতুলকে বলল- 'এই ঘটনা কোন একটা ছোট ঘটনা নয়। এর একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে। তোর এই উপলব্ধি তোকে জীবন পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, আমরা খুব আনন্দিত বোধ করছি যে তুই এই ঘটনা আমাদের বলতে এসেছিস।'

চিনুদা, চঞ্চলদাদের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মিতুল আরও একবার পাখার সুইচ্ পরখ করে দেখল- ঠিকই চলছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সে গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল কী এক অবাক বিস্ময়ে! নীচে মানুষের কর্ম চঞ্চলতা, বাস ট্রামের শব্দ, সবার ব্যস্ততা। আর মিতুল তখনও সেই বিস্ময়ের ঘোরে।

....❋....❋....❋....

মনসঙ্গীত (১)

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

সাধন আমার তোমাদেরি
সকল ভালোর তরে,
তোমরা আমার প্রতিচ্ছবি
প্রাণ আমারি ঘরে।

তোমরা আমার চোখের তারা
শ্বাস আমারি প্রাণের ধারা
কোন জনমের আশিস বয়ে
আনলে হৃদয় ভরে।

ঘরের নিয়ম মানতে হবে
নইলে জীবন বিফল যাবে
মন্দ-ভালোর ঘাত-প্রতিঘাত
নামবে জীবন পরে।

তোমরা যেদিন জীবনপথে
চলবে সফল আপন রথে
ভালোর লাগি শাসন আমার
জাগবে চরাচরে।

....❋....❋....❋....

আজ বসন্ত যে মোর দুয়ারে

হুসনে জাহান

সারা জীবন ধরে প্রতি বছরেই পহেলা বসন্তে আমরা সবাই মিলে হলুদ রঙের কাপড় পরেছি। সেই সাথে যে যা পেরেছি, তাই দিয়ে হাতে বা খোঁপায় ফুলের মালার সাজসজ্জা। বসন্ত রঙের ঋতু, গাছে গাছে নতুন কচি ছোট্ট লাল সবুজ পাতা উঁকি মারে, নানা রঙের ফুল ফোটে, ঝিরঝিরে মোলায়েম বাতাস শরীর ও মনে পরশ বুলিয়ে দেয়। গাছের ডালে কোকিলের কুহু কুহু ডাক আরো জানিয়ে দেয় বসন্তের আগমন। মনটা হালকা বাতাসের সাথে উড়ে চলে আকাশের পানে। কিন্তু কখনও তো ভেবে দেখিনি বসন্তের সাথে হলুদের কী সম্পর্ক! হ্যাঁ, হলুদ রঙটা উজ্জ্বল ও ফুর্তির প্রতীক। আরে তাইতো! এটা তো মনে আসেনি যে জ্বলজ্বলে সোনালী রঙের হলুদ হাসি যে আমাদের সূর্য-মামারও বিশেষ আশীর্বাদ। মামা যখন দূর গ্রীষ্ম দেশের সফর শেষে শীতের এলাকায় ফিরবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ান, তখন তাঁর চড়চড়ে কড়া চাহনির সামনে বাদল, বরফ তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে। সেই সুযোগে সারা প্রকৃতি সূর্যের অভ্যর্থনার জন্য সারা শরীরে হলুদের প্রলেপ লাগাতে উঠে পড়ে লেগে যায়। আর শীত বিদায় নেবার আনন্দে সবাই তখন গাছের ফুলপাতার আগমনে সাড়া দিয়ে শীতের পোষাক ছেড়ে হলুদ কাপড় পরে প্রকৃতির সাথে হাত মেলায়।

ওহো, আর একটা কথা তো বেমালুম ভুলে গেছি; এদেশে আমরা যে স্টেটে থাকি তাকে তো গোল্ডেন স্টেট্ বলা হয়। আর এখানকার স্থানীয় ফুল সোনালী রঙের পপি- যেখানে সেখানে আপন মনেই জন্মে থাকে ছোট্ট তারার মতো আর নাম না জানা হলুদ ফুলটার মতই। ভারি সুন্দর দেখায়! আমি তো মনে করি এই কারণেই গোল্ডেন স্টেট্ নামটা এখানকার জন্য যথোপযুক্ত। কিন্তু এই স্টেটের নামকরণের পিছনে আর একটি কারণও যে নিহিত আছে সে কথা না বললে তো চলবে না। আমেরিকার উপস্থাপনের প্রারম্ভে মানুষ যে সোনার সন্ধানে মরিয়া হয়ে রক্তারক্তি করে এখানে ছুটে এসেছে চারিদিক থেকে, সে কাহিনীও তো পড়েছি ও সিনেমায় দেখেছি। তাইতেই মনে হয় বসন্ত কালের হলুদ রঙ এখানে এত প্রোজ্জ্বল। সোনা, ফুল আর সূর্যমামার প্রাচুর্যের প্রভাবই এই স্টেটের নামকরণের সূত্র।

তাই এবার এখানেই প্রথম উপলব্ধি করলাম বসন্তের রঙ কেন হলুদ। ওমা! আসল কথাই তো বলা হয়নি- আমার জন্মও যে সূর্য রাশিতেই। সে কারণেই হয়ত আমার মেজাজে মামার প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে পারেনি। হাজার হলেও আমরা একই গোত্রের তো! এদিকে সূর্যমামার সাথে আমার যে 'love hate' সম্পর্ক সেটাও আমি চিরকাল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কারণ না আমি মামার প্রচন্ড তাপ সইতে পারি, আবার তাঁর অনুপস্থিতির অন্ধকার ও কনকনে ঠান্ডা- সেও আমার সয় না। আর বাইরে বার হলে তো কথাই নেই- মামার রশ্মি থেকে চোখ বাঁচাতে কালো চশমা পরতেই হবে। এইজন্যই বোধহয় সূর্যের সোনালী, হলুদ, কমলা রঙের প্রতি আমার এত গভীর আসক্তি। কারণ এগুলোই তো সূর্যরশ্মির মার্কামারা রঙ। কিন্তু যে যাই বলুক, হলুদ রঙটা কেমন যেন অন্যসব রঙের চেয়ে চোখের সামনে বেশী ফুটে ওঠে, তাই না?

আমাদের বাসা এদেশে পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি। আবহাওয়া মোটামুটি মোলায়েম। আমার অবশ্য শীতের মৌসুমে এখানেও দারুণ কাঁপুনি ধরে যায়। এটা যে শুধু আমার বার্ধক্যের কারণে তা বলব না। মনে হয় ছোটবেলা থেকেই শীতটা আমাকে চিরকাল একটু বেশীই কাবু করেছে। মনে পড়ে দেশে থাকতেও যে বছর শীত চেপে আসত সেসব রাতে বিদেশী বুড়িদের মতো মাথা-কান ঢাকা কাপড়ের টুপি পরে ঘুমোতাম। কাজেই এটা আমার বরাবরেরই এক সমস্যা বলা যেতে পারে। তাই বাসায় সবাই যে temperature রাখা পছন্দ করে তাতে আমায় শীতের জামাকাপড় পরে ঘোরাফেরা করতে হয়। আর বাইরে বেরোলে তো রক্ষা নেই। এদেশের লেয়ারের প্রথায় (অবশ্যই মাথা ঢেকে) কম করে অন্তত চারটে লেয়ারের কমে তো চলবেই না আমার। যেন zero ডিগ্রির বহু নীচে তাপমাত্রা চলছে। একবার এদেশেরই উত্তরের এক শীতের অঞ্চলে পড়তে এসে এক বিদেশী মহিলার সাথে এক ঘরে থাকতে হয়েছিল। শীতের রাতে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ে তার সাথে রোজই লড়াই চলত। আমি রাখতাম ৬৫-৭০ এর মাঝামাঝি। সে শুতে আসত অনেক রাতে, আর এসেই চুপিচুপি ৫০শে নামিয়ে দিত কন্ট্রোলটা। শেষ রাতে যখন ঠান্ডার চোটে হি হি করে কেঁপে ঘুম ভেঙে যেত, উঠে টের পেতাম তার কারসাজি। শেষে পর্যন্ত নালিশ করে ডর্মের একটা একা কামরা নিয়ে আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলাম। কী করি! সবারই তো কোন না কোন ব্যামো থাকে, এটাই আমার ব্যামো।

অন্যান্য বারের মতই শীত পার হয়ে বসন্তের আমেজ লাগতেই ডালে ডালে কচি পাতার আবির্ভাব দেখে মনটা দারুণ আবেগে আকুল হয়ে পড়ল। গাছে গাছে নানা রঙের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। সারি সারি গাছে সাদা, লাল, বেগুনি ফুলের সম্ভার। বাসায় আমার ছোট্ট টবগুলোর মরা পাতাসহ ঝিমিয়ে পড়া ডালে ডালে কচি কলাপাতা রঙের ছোট ছোট পাতা গজাতে দেখলাম তিন মাস শিশির ও কুয়াশার কবল থেকে নিস্তার পাবার পর। সবুজ লম্বা ঘাস ও আগাছায় শীতের শুকনো কঠিন মাঠ ভরে গেল। যেদিকেই হাঁটি ফুলের মৃদু মন মাতানো ঘ্রাণে শরীর স্নিগ্ধ করে দেয়। এর আগে M.A. শেষ করা, চাকরি, স্বামী-সংসার এবং তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবার তাগিদে বসন্তের আগমন এভাবে উপভোগ করার সুযোগ আমার হয়নি কখনও। তারপর চাকরির ফাঁকে বসন্তকালে তো এদেশে বেড়াতে আসার সুযোগও পাইনি।

এর কয়েকদিন পর বেশ দূরের এক লম্বা পথে কিছুটা পার্বত্য অঞ্চলীয় অন্য এক শহরে যাবার সময় চোখে পড়ল রাস্তার দুপাশে শুধু সেই হলুদ আর হলুদে যেন মাঠ-ঘাট পাহাড়, জঙ্গল সব চোখ মেলে হেলেদুলে খিলখিল করে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওমা, সত্যি তো কী সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে! সূর্যমুখী আর আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে সরষে ক্ষেতের হলুদ রঙই আগে চোখভরে উপভোগ করেছি আর ড্যাফোডিলের সৌন্দর্যের বর্ণনা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু এবার এখানে প্রথম দেখলাম প্রকৃতির আসল হলুদের মেলা। পাহাড় ও মাঠের নিজস্ব বুনো ঘাসের উপর চিকন চিকন লম্বা

ডাঁটার ডগায় অসংখ্য হলুদ ছোট ছোট তারা খুশিতে ঝলমল করছে। সব জায়গা ছেয়ে আছে শুধুই হলুদে- ছোট, মাঝারি ও বড় বিভিন্ন সাইজের ভুরি ভুরি হলুদ ফুলে সমস্ত উঁচু, নীচু, সমতল ও খোলা জায়গা ভরে আছে। কী করে এত হলুদ ফুল এল! এরা সব কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন? আমারও যে ওদের সাথে গলাগলি করে দুলে দুলে আনন্দে গড়াগড়ি দিতে মন চাইছে। তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে, এই তো আমাদের দেশের পহেলা ফাগুনের রঙ! আমি এখন দেশে নেই, আর এখানে দেশী পরিবেশও না থাকায় হলুদ কাপড় পরা হয়নি, কিন্তু এখানের প্রকৃতি-মাতা বসন্তের হলুদের সাথে হাতেনাতে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিলেন। বসন্তও তার নিজের রঙ দেখিয়ে আমার কাছে ধরা দিল, তার শরীরের আসল কাঁচা সোনা রঙ আর লুকিয়ে রাখতে পারল না। এভাবে আগে বসন্তের রঙ তো কখনও আমার চোখে পড়েনি ভাই! তাই বলি, কবি কেন বলেছিলেন-

‘ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ...’!

প্রকৃতির গাছপালা ও তাদের ফুল-ফল, পাতার রঙ বদলের আমি চিরকালই দারুণ প্রেমিক, সে বাসস্থানে নিজের পরিচর্যায় পালন করা, বা রাজপথের ধারে, বন-জঙ্গলে, বাগানে বা মাঠে-ঘাটে যেখানেই হোক না কেন। Wordsworth, Keats, Herrick, Frost- এঁদের কবিতার ছাত্রী আমি, আর রবিঠাকুরের গানের সাথে বড় হয়েছি; তাঁদের শব্দের তুলিতে আঁকা প্রকৃতির দৃশ্যপটের প্রতিচ্ছবি আমার অন্তরের গভীরে চিরকালের তরে স্থান করে নিয়েছে। এদেশে উত্তরের এক শহরে পড়বার সময় পুরো এক বছর পড়শোনা থেকে ফাঁক পেলেই প্রাণভরে বিভিন্ন ঋতুর রূপ বদল ও প্রভাব উপভোগ করবার চেষ্টা করেছি। হেমন্তকালে বনে বনে আবিরের রঙ ছাড়ানোর ছবি আমার মনের আঙিনায় স্থায়ী বাসা বেঁধে আছে। এর জন্য আমার শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় পিতার পুরোপুরি অবদান স্বীকার করতেই হবে। তিনি নিজে হাতে বাগানের পরিচর্যা করে বিভিন্ন ফুলের বাগান সাজিয়ে হাতে কলমে আমাদের যে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে তাদের ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন তা আমাদের আজীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাছাড়া এই আশির কোঠায় পৌঁছে বার্ধক্যের কর্মহীন অনভ্যস্ত সমাজ ও সংস্কৃতিবহুল জীবনে প্রকৃতির সঙ্গই তো একমাত্র সীমাহীন নির্মল আনন্দের খোরাক জোগাতে পারে।

জীবনে চলার পথে আরো বুঝতে পেরেছি মানুষের মনের অপূর্ণতার হতাশা দুটো জিনিস দিয়ে পূরণ করা সম্ভব- এক- ধর্মের মূলমন্ত্রে আত্মনিয়োগ আর দ্বিতীয়- প্রকৃতির মূক সৌন্দর্যের সাহচর্য। প্রকৃতির নানান ঋতুর বিভিন্ন দৃশ্যই জীবনের দর্শন পুরোপুরি তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কখনো কখনো দুঃখজনক হলেও ব্যক্তিগত আঘাতের উদ্দেশ্য তাতে নিহিত থাকে না। এজন্য অনেক মানুষ গাছপালা, এমনকি পশুপাখিদের সাথে ভালবাসা ও বিশ্বাসের আদান প্রদানে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়।

হায়রে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানব! তোমার চরিত্র শুদ্ধির উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে, বারে বারে অবতার ও পয়গম্বরের আগমন হয়েছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি স্রষ্টার সেই আদর্শ মানবের স্তরে উন্নীত হতে পারবে? এ বিরাট জিজ্ঞাসার উত্তর কার কাছে পাওয়া যাবে?

লেখিকার নিবেদনঃ এটি লেখা শুরু হয়েছিল বসন্তের আগমনীতে, কিন্তু শেষ হ’ল শারদীয়ায় এসে। কিন্তু মনের দিগন্ত অসীম। আশাকরি সেই অসীমে পাখা মেলে দিতে সুধী পাঠকের অসুবিধা হবে না।

••••❋••••❋••••❋••••

প্রণমি

দীনেশ দাস

দেখেছি তোমার নামে সবার প্রথমে
শ্রাবণে ধানের শীষে দুধটুকু জমে।
তোমারি তো নামে-
বৈশাখে আখের ক্ষেতে যত মধু নামে।
তবুও হাজার হাতে হাওয়া দেয় ডাক-
কোথায় মাটির স্বপ্নে শিলীভূত ২৫শে বৈশাখ।
কোথায় আকাশে বাজে সোনার সরোদ,
২৫শের ভোর গলে হয় গিনিসোনা রোদ।
তুমি বনস্পতি, তোমার পায়েতে থরে থরে
অজস্র শব্দের রঙ কৃষ্ণচূড়ার মতো ঝরে।
তুমি এক অবাক মৌচাক-
কথাগুলো চারপাশে ঘোরে-
যেন গুনগুন সুর একঝাঁক।
তোমার ছন্দের নদী জমা হ’ত যদি
পৃথিবীতে হ’ত মহাসমুদ্র বলয়,
ঝুরঝুরে গানের মাটি জমে জমে হ’ত
আরেক নতুন হিমালয়।
আকাশে বরুণে দূর স্ফটিকে ফেনায়
ছড়াল তোমার প্রিয়নাম।
তোমার পায়ের পাতা, সবখানে আছে পাতা
কোনখানে রাখিব প্রণাম?

••••❋••••❋••••❋••••

ফাদার্স ডে

জয়া ঘোষ

সময়টা সত্তর-আশি দশকের কলকাতা, যখন ভালবাসা প্রকাশ না করাটাই যেন এক অলিখিত নিয়ম ছিল আমাদের সমাজে, সে ভালবাসা বাবা মায়ের প্রতি হোক বা বন্ধুর প্রতিই হোক না কেন। বড়দের জন্মদিন পালন করলেও তাঁরা বিব্রত বোধ করতেন। উপহার দিলে বলতেন, 'দূর, আমাদের কি আর এসবের বয়স আছে?' কিন্তু জানতাম যে তাঁরা মনে মনে খুশি হতেন। ছোট্ট মেয়েটির রোল্ মডেল্ যে মানুষটি, যাঁর শক্ত হাতের আঙুলের মধ্যে নিজের কচি হাত সহজেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে বড় রাস্তা পার হওয়া যায়, বা ছোট্ট ছেলেটির চোখে দোতলা বাড়ির মতো লম্বা উন্নত শির মানুষটি, যাঁর সঙ্গে কথা বলতে একটু ভয় লাগলেও আদর করে জড়িয়ে ধরে যখন তখন আবদার করা যায় চকলেট বা চোঙা প্যান্ট, টেপ্ রেকর্ডার কিম্বা টেলিভিশনের। তিনি যে ওদের একান্তই আপন, তিনি বাবা। একটি শিশুর চোখে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অকৃত্রিম ভালবাসা আর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রতীক তিনি। সেই মানুষটির প্রতি ভালবাসা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্যে কোন নির্ধারিত দিন ছিল না তখন। জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন ফাদার্স ডে পালন হ'ত তখন আমাদের মধ্যে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। আর পাঁচটা রবিবারের মতোই ঐ দিনটিতে কোন বাবার সকালটা শুরু হ'ত থলি হাতে ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে বাজার যাওয়া, ব্যাগ ভর্তি সবজি, মাছ রেখে, গরম গরম কচুরি, মালপোয়া, জিলিপি, সন্দেশের প্রাতরাশের ফাঁকে একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া। রিক্সা চেপে ফেরার পথে বাবার গায়ে গা লাগিয়ে মনের আনন্দে ছুটির দিনে বিশ্বজয়ের গর্ব মেয়ের। চোখ নাচিয়ে মাকে বলবে সেসব কথা! কেউ বা ছিলেন ছেলের সাথে খেলার মাঠে, কেউ বা আবার গড়ের মাঠে ছেলে মেয়েকে নিয়ে গোলগাপ্পা খেতে। কিম্বা সেদিন মহাভারত দেখতে বসে মেয়ের হাতের চাউমিন আর চায়ের কাপে হঠাৎ খুশির কোন আনন্দে কারুর বাবা উঠতেন মেতে। এই রকমই ছোট ছোট মুহূর্ত নিয়ে জুনের তৃতীয় রবিবারগুলো এসেছে, গেছে বাবার সাথে। তারপর ঠিকানা বদলায়। আমেরিকায় প্রবাসী হয়ে জানলাম ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে, আরো কত ডে ...।

ফাদার্স ডে পালনের ধারণা মিস্ সোনোরার মাধ্যমে প্রথম আমেরিকাতেই শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াশিংটনের মেয়ে মিস্ সোনোরা লুইস্ স্মার্ট ডড্। মা-হারা সোনোরার বাবাই পাঁচ ভাইয়ের সাথে তাঁকে মানুষ করেন। মায়ের মতো বাবারও যে সংসারে অবদান কম নয় সেটা বোঝানোর জন্যই সোনোরা ঠিক করেন ফাদার্স ডে পালন করবেন। ফাদার্স ডে একটি আলাদা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সোনোরা চেয়েছিলেন জুনের কোনও এক রোববার বাবা-দিবস পালন করবেন। তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাবার জন্মদিন ১৯ শে জুনকে ফাদার্স ডে হিসেবে। সেই হিসেবে ১৯১০ সালের ১৯ শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বাবা-দিবস পালিত হয়। অবশ্য তার আগে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার রবার্ট ওয়েব ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই ফাদার্স ডে পালনের উদ্যোগ করেছিলেন। তবে তাঁর সে উদ্যোগটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি বলে মিস্ সোনোরাকেই ফাদার্স ডে-র প্রবক্তা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জন্‌সন্ ফাদার্স ডে একটা ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন।

বাবার প্রতি সন্তানের ভালবাসা প্রকাশের জন্য দিনটি বিশেষভাবে বাবাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এদিন বাবা, দাদুদের ফুলের তোড়া, টাই, ঘড়ি, জামাকাপড়, গ্রিটিং কার্ডস্ ইত্যাদি দিয়ে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানায় ছেলেমেয়েরা। কেউ আবার বার্বিকিউসহ পিকনিক করে দিনটি পালন করে। বাবার সাথে গলফের মাঠে দিব্যি হেসেখেলে কাটিয়ে দেয় দিনটি। বুড়ো বয়সে অনেকেই এখানে 'ওল্ড হোম'এ দিন কাটান। তবুও এদিন সন্তানের ভালবাসায় আবার নতুন করে বাঁচার আশা ফিরে পান।

পৃথিবীর সকল সন্তানের কাছে বাবা একটা আদর্শ- ছোট থেকে যাঁর শক্ত হাত ধরে একটু একটু করে পথ চলতে শেখা, স্কুলে ভর্তি হবার প্রথম দিনটি থেকে চাকরির ইন্টারভিউ-এর টিপ্‌স্ পর্যন্ত তিনি আছেন সন্তানের পিছনে। বাবা শব্দটির মধ্যে কোথায় যেন একটা উহ্য আধিপত্য লুকিয়ে আছে। পরিবারে তাই তাঁর কথার উপর আর কারুর কথা চলে না। শিশু তার নিষ্পাপ চোখে তার বাবাকে দেখে পরিবারের সবচেয়ে ক্ষমতাবান, জ্ঞানী এবং গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতার নামেই সন্তানের পরিচয়। তিনিই সন্তানকে দিয়ে থাকেন অর্থনৈতিক নির্ভরতা। মেয়েরা জীবনের শুরুতে আদর্শ পুরুষ হিসেবে বাবাকেই চেনে। সেই আদর্শ পুরুষটি রাশভারী, গুরুগম্ভীর, সব সময় নিজের কাজে ব্যস্ত বাবা হতে পারেন, আবার আমুদে, মনমেজাজী, প্রাণচঞ্চল, দিলখোলা দিলদরিয়া, মাই ডিয়ার বাবাও হতে পারেন। বাবা যেরকমই হোক না কেন সন্তানের চোখে তিনি একান্ত আপন, বিশেষ একজন মানুষ। পরিবারে মায়ের অবদান সবার উর্দ্ধে, কিন্তু যে বাবা নিজের সুখ ভুলে সন্তানের ভালোর জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেন, তাঁদের স্থান মায়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে বহির্বিশ্বে সিঙ্গল পেরেন্ট হিসেবে মায়েরা একাই শিশুকে সব ধরনের নির্ভরতা বা আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে পারেন। বর্তমানে আমাদের দেশেও সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে আমেরিকায় যেসব সন্তানরা বাবা ছাড়া বড় হয়েছে বা বাবা মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে তাদের মানসিক চরিত্র গঠন সবসময় স্বাভাবিক হয় না। আর্থিক স্বচ্ছলতা কমে যায় বলে তাদের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়, ফলে তাদের অনেকেই জেলে যায় অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকার জন্য। এরা নিজেরাও বড় হয়ে স্ত্রী বা প্রেমিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং পরিবার ছেড়ে চলে যায়। আমেরিকাতে যেসব ছেলেমেয়েরা মাঝপথে হাইস্কুল ছেড়ে দেয় তাদের প্রায় সাত শতাংশ পরিবারে বাবা নেই। আমেরিকায় আত্মহত্যার ৬৩% ঘটে পিতৃহীন পরিবারে। আমরা মনে করি পশ্চিম পৃথিবীর সন্তান বাবা মাকে দেখে না, তাই বছরে একটা দিন তাদের উপহার দিয়ে ভালবাসার মূল্যায়ন করে ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে করে। কথাটা পুরোটা ঠিক নয়। আমেরিকান পরিবারে সন্তানদের একটু তাড়াতাড়ি স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়। মোটামুটি

কলেজে পড়ার সময় সন্তান বাড়ির বাইরে থাকতে শুরু করে। সেইজন্য মা বাবার সাথে কম দেখা হয়। তাই বাবা দিবস উপলক্ষ্যে বাবাকে ভাল কিছু একটা উপহার দিয়ে বাবার সঙ্গে দিনটা কাটায়। একসঙ্গে না থাকলেও পরিবারের সাথে সন্তানের সব সময়ই একটা সংযোগ থাকে। অনেক সময় প্রাত্যহিক জীবনের ঝামেলায় সন্তান হয়ত বাড়ির খবর নিতে পারে না। স্বার্থপর সমাজ ব্যবস্থায় কিছু মানুষের মধ্যে বাবার প্রতি অবহেলা বা দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা আছে, তখন এই বিশেষ দিনই তাদের পিতার প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। সন্তানের গুণগ্রাহিতার উপলব্ধি বাবার মনেও এনে দেয় অনাবিল আনন্দ। হিন্দি ছবির ভাল বাবা অলোকনাথ, বা শাহ্রুখ খানের মতো 'কুল' বাবা, কিম্বা ওবামার মতো প্রেসিডেন্ট বাবা, সদ্যজাত শিশুকে বুকে নিয়ে 'তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত' গান করা বাবা... পিতা যে কোনরকমই হোন না কেন ফাদার্স ডে'র দিনে তাঁরা সকলেই সন্তানের চোখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা!

১৫ই জুন ফাদার্স ডে, বাবার কথা ভাবার দিন। সন্ধ্যে নামার একটু আগে পশ্চিমে নয় পুবের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবব আমি, যে দেশে রাত হচ্ছে ফিকে সেখানে আমার সুজন বৃদ্ধ হলেন কার অপেক্ষায়!

····❋····❋····❋····

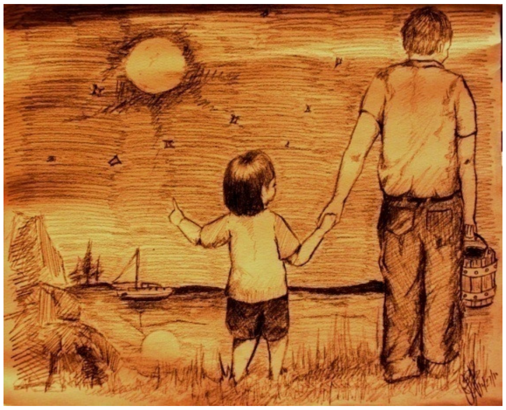

হৃদয়

রুমকি দাশগুপ্ত

একদলা অদ্ভুত অনুভূতি যেন গলার কাছে আটকে আছে। একে উগরে ফেলা অসম্ভব! আবার গিলতে গেলেও ভীষণ ব্যথা লাগে। কী গম্ভীর, কী গভীর এ ব্যথা। রঙের রাগে কাটাকুটি এই অনুভূতি, ক্ষত-বিক্ষত, রক্তঝরা একটা হৃদ্‌পিন্ড, এরই ফাঁকে-ফোকরে ফাটল বেয়ে সোনাঝরা রোদ্দুরের মত নামে আনন্দের ঝিলিক। এই সুন্দর আনন্দের প্রলেপ সত্ত্বেও এত গভীর ব্যথা কেন? চারিদিকে নারী পুরুষ ছিটানো, আর ছড়ানো অস্থিরতা, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, স্বেচ্ছাচারিতা। এ হৃদয় কি এক পাগলের হৃদয়, না ছন্নছাড়া, আলাদা? কে বলে দেবে আমায়? সব ছেড়ে এক দৌড়ে পালান যায় না? চেষ্টাই বৃথা। ব্যথাটা যে গলার মধ্যে আলুর মত আটকে আছে! বাইরে তো আর নয়, যে একদৌড়ে পালানো যাবে!

বুড়োআংলা তাই ঠিক করল, ও মেকী হাসি হাসবে সবসময়। মেকী সুখে ভাসবে। যেন কেউ না টের পায় তার গভীর ব্যথার কথা। সে তাই রোজ আলুসিদ্ধ ভাত খায়, এটা তার ভীষণ পছন্দের খাওয়া। সে আগান-বাগান, বন-জঙ্গলে ঘুরে, আম, জাম, কাঁঠাল, নানা শাকপাতা কুড়িয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার মুখে ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে তার চোখে মুখে সেকি আহ্লাদ! ঝুড়িটা দাওয়ার কোণে রেখে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে সে রাতের খাবার খায়। আহা! কি পরম আনন্দ এই সেদ্ধ-ভাত খাওয়ায়।

জ্বালা রে জ্বালা! হতচ্ছাড়া ব্যথাটা ঘাপটি মেরে এতক্ষণ যেন কোথাও লুকিয়েছিল, যেই না একা পেয়েছে, অমনি মাথাচাড়া দিয়ে আবার রক্ত ঝরায়। বুড়োআংলা ভাবতে বসে..., বাঁচার উপায় তার বের করতেই হবে। এই ব্যথাটাকে জিততে দিলে চলবে না কিছুতেই। ভাবতে ভাবতে সে এক সময় ঘুমিয়েই পড়ে। দেহ তো তার ক্লান্ত হয়েই ছিল। তারমধ্যে সেদ্ধ-ভাতে পেট ভরপুর।

ঘুমের মধ্যে সে নানান স্বপ্ন দেখে। প্রথমে অশান্ত সব স্বপ্ন। গলায় দড়ি দিয়ে কেউ ঝুলছে, ভীষণ তেষ্টা, জল কৈ জল? এপাশ ওপাশ সেপাশ করতে করতে সে উঠে বসে। ঘরে স্নিগ্ধ আলো, ফুলের সুবাস। এসব এল কোথা থেকে? এই সব স্বপ্নের মাঝে সে দেখল তার কবে মরে যাওয়া মাকে। মায়ের হাতে জপের মালা। মুখের এক পাশ গম্ভীর, অপর পাশে মিষ্টি হাসি। মা বুড়োআংলার হাতে জপের মালাটা ধরিয়ে দেওয়া মাত্রই বুড়োআংলার চোখ খুলে গেল, সে বুঝল এটাও ছিল স্বপ্ন। সে ঠিক করল এবার থেকে সে দিব্যনাম জপবে। কি জানি, যদি অসহনীয় ব্যথাটা নিজেই এক সময় ছেড়ে পালায়। এই ওঝা-টোঝার মতন আর কি! না হোক জলপট্টির কাজই যদি হয়! তাই-

'দিনান্তে ইষ্টনাম,
মেলে যদি ব্রজধাম!'

····❋····❋····❋····

চাঁদার দেশ

রঙ্গনাথ

নেপথ্যে ঃ

এ দেশে চাঁদা দেয়া-নেয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। উত্তমপুরেও তাই। বড় শহরের মত এখানে কোটি কোটি টাকা নয়, তবে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার। সাধারণ মানুষ আর সরকারী প্রশাসনের মাঝখানে মহাশক্তিমান চাঁদাবাজদের অবস্থান। সবাই ওদের ভয় পায়। লোকে ওদের গুন্ডা-পান্ডাও বলে। প্রশাসন আর এদের মধ্যে তফাৎ আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। ওরা সরকারী পার্টির নাম করে টাকা চায় আর জোর-জবরদস্তি করে তা আদায় করে। ওরা বলে বড় বড় প্রজেক্ট, ক্লাবের খরচ এবং পার্টির কাজে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। আসলে কিছু একটা বলতে হয় তাই তারা এসব বলে। অন্যের টাকার উপরেই এরা বাঁচে, পার্টি নেতাদের অর্থ জোগায় আর মহা আনন্দে দিন কাটায়। জনতা এদের ভীষণ ভয় পায়। ওরা যখন আসে তখন সবাই পালিয়ে রক্ষা পেতে চায়।

প্রথম দৃশ্য

(উত্তমপুর পার্টি অফিসে পার্টি-নেতা রানার প্রবেশ)

রানা– কোথায় তোরা সব? হীরা, পান্না, আকাশ! কোথায় তোরা?

(নতুন ক'জনসহ সবাই পানাহার করতে করতে প্রবেশ করবে।)

পান্না– স্বাগতম! লম্বা দিনের শেষে একটু গিলছিলাম মোরা।
আয় আয় সব। এসো এসো রাজধানী ফেরৎ রানাভাই।
ত্রিশ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট তো পেলে!
মিঠাই, শ্যাম্পেন চাই!

রানা– **(নতুনদের দিকে চেয়ে)** এরা কারা, নতুন কর্মী নিশ্চয়?
আকাশ, এদের নিয়ে যাও বসার ঘরে,
আমরা আসছি, চাই একটু সময়।

পান্না, আমি পাইনি কন্ট্রাক্ট! মহানেতা দিয়েছিল কথা–
পার্টি অফিসে গিয়ে দেখি সবাই ক্ষুব্ধ, বেশ বড় জটিলতা।
চাঁদা চেয়েছিল মাসে মাসে দশ লক্ষ টাকা, দিয়েছি সাত।
মহানেতার সাথে দেয়নি কথা বলতে, তাই হয়নি সাক্ষাৎ।
তাদের প্রত্যাশা ছিল, যা চেয়েছিল দিতাম তার চেয়ে বেশী
তাই নাকি নিয়ম; তা করলে মহানেতা হত ভীষণ খুশী!

আজ কিছু কথা বলার আছে। হীরা কি কিছু বলতে চাও?

হীরা– আনি আমরা কুড়ি লক্ষ টাকা, কেন মাত্র সাত লক্ষ দাও?

রানা– খরচের হিসাব কি রাখো? জানো কি খরচ বেড়েছে কত?
যা জানো না, যা বোঝ না, তা নিয়ে ভাবো কেন এত?
শোন এবার, সবাই পাও বোনাস্ যখন কুড়ি লক্ষ আসে।
এহেতু রংধনু ক্লাবে হয় নৃত্য, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রতি মাসে।
এনেছি বড় বড় নেতাদের, হয়েছে দেখা তাদের সাথে।
কী না করেছি, লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে না কি এসব করাতে?
'ফকির হটাও' প্রজেক্টে দিয়েছি চাল, ডাল, কাপড়, কম্বল-
আরো কি প্রশ্ন আছে?

হীরা– রানাভাই, সবকিছু এখন ঝকঝকে উজ্জ্বল!

পান্না– রাজনীতির এমনি ধারা, সব পার্টি হেরে যায় পরের ভোটে
ভাগ্য ঘোরানোর সময় অল্প, আর তো মাত্র দু বছর মোটে।
অনেকে হচ্ছে কোটিপতি, তুমি এখনও পারোনি তা হতে;
তুমি এ এলাকার বড় নেতা, চাই কোটিপতি হও ভবিষ্যতে।

কথা হয়েছে নিশ্চয়। রানাভাই, পেয়েছ কি কোন ভরসা?
তোমার কিছু একটা পাওয়া উচিত। পাবে কি কিছু সহসা?
মন্ত্রী টন্ত্রী কিছু একটা? হবে সুনাম কত! পাবে কোটি কোটি!
আমাদেরও হবে বেশ কিছু; নিশ্চয়, আমরাও হব লাখপতি!

রানা– জেনেছি, ভাংড়া-ব্রিজ্ আবার নির্মাণ হবে সাত মাস পর।
যদি ঘাটতি পূরণ করি, যদি চাঁদা দিতে না করি গড়বড়
আশা রাখি, তিন মাস পর পাব একশত কোটির কাজ।
এটা পেতেই হবে, তাই শুধু চাঁদা নিয়ে কথা বলব আজ;
আজ মাসের সাত, এ মাসে আসার কথা এক হাজার খাম।
সব এসেছে কি? আসেনি? চাই, চাই জানতে সবার নাম।
হীরা, কে দিয়েছে ফাঁকি? কোথাকার তারা? এরা কে কে?
এ শহরে হচ্ছেটা কি? কেন পাচ্ছি কুড়ি, ত্রিশ লক্ষ থেকে?

হীরা– মধ্য বাজারের দোকানীরা ঠিক দেয় পাঁচ লক্ষ প্রতি মাসে
বন্দর হতে দুলাখ, দুলাখ দারোগা-অফিসার থেকে আসে
ঔষধের দোকান চার লক্ষ, বাস মালিকেরা দেয় লক্ষ আরকি।
কলেজ রোড, সদর রোডের দোকান, উত্তরপাড়া থেকে বাকি।
মানিক দেবে দশ হাজার টাকা- তা হয়েছে দশ কিলো চাল!
পাই না অনেকের দেখা, দেখা পেলে বলে 'আজ নয় কাল'।
স্কুল কলেজ থেকে পাই না চাঁদা, আমরা নাকি গুন্ডা-পান্ডা।
ধনপতি বলে, 'আর যদি চাঁদা চাও, খাবে থাপ্পড় আর ডান্ডা।
গন্ডু পাড়ার ওরা লাঠি নিয়ে আসে ছুটে- করি নাকি উৎপাত!

রানা– কে কে গিয়েছিলে গার্লস্ কলেজে? এনেছ এক মহা ঝঞ্ঝাট!

পান্না– কী করে জানলে রানা ভাই? হীরা গিয়েছিল কিছু পেতে।

হীরা– গার্লস্ কলেজে যাইনি কখনও, ভাবলাম একবার হবে যেতে
শ-খানেক প্রফেসর, যদি মাসে মাসে আসে পঞ্চাশ হাজার–

রানা– বাঃ বাহ্, জানো, প্রিন্সিপালের ছোট এক ভাই ব্রিগেডিয়ার!
সে জানতে চেয়েছে কারা কারা চাঁদাবাজি করে এ শহরে–

হীরা– ক্ষমা চাই রানা ভাই। ম্যাডামকে বলিনি তত জোর করে–
যখন বলেছে পুলিশ আসছে, আসছে ক'জন আর্মির লোক
কেটে পড়েছি। বিশ্বাস করো, চাইনি কোন ঝঞ্ঝাট হোক-

রানা– হীরা, থামো! ভেবেছি, কিছুদিন আমিও যাব তোমাদের সাথে
যে শুনবে না কথা, পাবে চরম নির্দেশ, তাকে হবে শাসাতে।
মাসে চাই ত্রিশ লাখ টাকা, আমাদের লাখ লাখ টাকা চাই!
টাকা আনতেই হবে, টাকা পেতেই হবে- এছাড়া পথ নাই।

হীরা– টেন্ডার বেচা-কেনা করি না কেন? এটা তো বিরাট ব্যাপার!

রানা– অঢেল টাকা জানি। মন্ত্রীরাই টেন্ডার নিয়ে করে কারবার
কোথা থেকে কী ঘটে বোঝা কঠিন– কেউ চায় না বলতে
বলে, বেশী করে চাঁদা তোলো; এখন এভাবেই হবে চলতে।

পান্না– শুনেছি এ জেলাতে নতুন কলেজ হবে, হবে কি এ শহরে?

রানা– নিশ্চয় হবে। তবে সাতজন মন্ত্রীর কলেজ পাওয়ার পরে।
জানো তো, পাশের জেলায় হয়েছে উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়-
কেরানী চাকুরির চাঁদা পাঁচ লক্ষ টাকা! লাখ টাকা রাখা হয়,
বাকি যায় হেথা সেথা। আর প্রফেসর দেয় আট থেকে বারো।
শত শত পদ খালি, কত টাকা পাচ্ছে, তাকি ভাবতে পারো?
এ সুযোগ পেলে আমাদের হ'ত না যেতে বাড়ি ও দোকানে।
টাকায় টাকা! কত লাখপতি, কত কোটিপতি দেখতে এখানে।

পান্না– কথাটা সত্য কিনা? ভর্তি হতে গেলে ছাত্ররা নাকি চাঁদা দেয়!

রানা– চাঁদা ঠিক নয়। কেহ ভর্তি হতে চাইলে ডোনেশন্ নেয়া হয়;
ফর্ম দেয়ার আগে দশ হাজার, তারপর চলে আলোচনা
ভর্তির সময় জানানো হয় এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ পাওনা।
যে দিতে পারে, সে পায় ডিগ্রি। যে অক্ষম, ভাগ্য মন্দ তার!
যদি বিশ্ববিদ্যালয় থাকত, আমাদের হ'ত কত না কারবার!

হীরা– মহানেতার ভাই, মোদের দেশভাই আবার আসবে কি হেথা?
এলে চাঁদা যা আসে–টাকা নিয়ে আর থাকে না মাথাব্যথা।

রানা– মহানেতার ভাইয়ের কথা-বক্তৃতা করে কাজ! এটা সত্য বটে।
কেন হয় জানো? অনেকে বলে, অপহরণ, গুপ্ত হত্যা ঘটে
দেশভাইয়ের আদেশে। সবার ভয়, গুম হবে টাকা না দিলে।
দেশভাই নেয় পাঁচ লক্ষ। এসো টাকা আনি সবাই মিলে।
যদি প্রয়োজন হয় আনব তাকে, হবে চারিদিকে তোলপাড়,
কি আর করা যাবে? গুম হলে হবে দু-একজন পেঁচু গোঁয়াড়।
আর তাকে যদি না পাই, জানি আরো আছে তিন চারটি দল
করবে কাজ দেশভাইয়ের মতো, ধমক দেবে, মিলবে ফল।

হীরা– যদি উত্তমপুরে হয় কেহ গুম, আমরা কি যাব জেলে?

রানা– তোমার মাথায় গোবর, এ চিন্তা কোথায় পেলে? গুম হলে
কেহ যায় জেলে? গুম হলে থাকে কি কোন প্রমাণ?
কেউ মুখ খুলবে না, জানো কি হয়? যাবে তোমার প্রাণ।
আমি কাউকে বলব? তোমরা বলবে? 'হ্যাঁ' না 'না'?

সবাই– না! না! না! পাগল পেয়েছ? কক্ষনো না...।

রানা– মিলেছে কি মহিলা দু-চারজন, কাজ করবে তোমাদের মতো?
তোমরা অপদার্থ! তারা হলে কত ভাল হ'ত!
যাবে দশটি পার্লারে, চুড়ি-শাড়ির দোকানে, লক্ষ তো আসবে–

পান্না– মেয়েরা করতে চায় না বদ কাজ; বলে, 'সবাই হাসবে'।
বলে কিনা, 'গুন্ডামি-চাঁদাবাজি বিবেকে বাঁধে, এসব অন্যায়'।
তাদের কথা, বিবেক-নীতি-সততা নিয়ে যতদিন বাঁচা যায়।

হীরা– রানাভাই, রংধনু ক্লাবে যে বোনটি আসে,
তাকে পেলে ভাল হবে।
তার বন্ধুও আছে; কাল তারা তোমার নাম করে
নিয়েছে কুড়ি হাজার।
সে ধমক দিতে ওস্তাদ; চাঁদা আদায় করার
সব গুণ আছে তার!
যতবার আসে সে টাকা চায়, আর পায়।
'তোমার টাকা যদি চাই'
তুমিই তো বলো, 'কাজ করো, কাজ করো ভাই'...

রানা– হীরা, থামো তুমি! মাত্রাহীন কথাবার্তা!
তোমার সাহস তো কম নয়,
এসব কথা আর যেন শুনতে না পাই।
আমাকে নিয়েও নিন্দা-চর্চা হয়!

(পর্দা বন্ধ হবে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

('মাণিক বিপণি'র সামনে কয়েকজন। 'ভেজাল জিনিস রাখা হয় না' সাইন বোর্ড থাকবে। কিছু লোক সেখানে আড্ডা মারবে।)

মধু– মাণিকদা, চাল চাই। চালের দাম কত, পনেরো না আঠারো?

মাণিক– মধু, আজ উনিশ, মহাজন আবার বাড়াল দাম;
ভাবতে পারো?

মধু– তোমার কাছে এলাম। সেদিন দাম বেশী চাইলে, কিনিনি তাই,
পাশের দোকানে ছিল কিছু কম, এ কারণে তার কাছে যাই।
চালে পাথর, ডালে ইঁট পাটকেল,
তেলেও কি ভেজালই না ছিল!
খাওয়ার পর সেদিন সব্বাই প্রায় মরণপ্রায়।
গিন্নী বেশ করে গালাগাল দিল।
বলে দিয়েছে ভেজাল খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া অনেক ভাল;
'খাঁটি আর ভেজালে তফাৎ বোঝো না'!
বলে সে কত না চ্যাঁচাল!

মাণিক– ফর্দটা দাও, একটু পরে এসে নিও। দাম- যা চাও দিও।

(মধুর প্রস্থান)

জনৈক– ওই যে দেখ, ঐ আসছে চাঁদা নিতে রানা-গুন্ডার দল,
তারা বড্ড ক্ষ্যাপা, কথা বললে করে ডান্ডা ধোলাই।
তোমরা দেখেও দেখ না কিছু, বলো না কোনকিছু
তাকাবে না তাদের দিকে; চলো ভাই এক্ষুনি পালাই।

(সবার নির্গমন, দলবলসহ রানার আগমন)

রানা– এই যে মাণিক, সে কবে কখন তুমি করেছিলে দেখা
লোক পাঠিয়েছি বারবার, প্রতিবার করেছ উপেক্ষা।
নিজে এসেছি দু-দুবার, হয়নি সাক্ষাৎ- জানো নিশ্চয়।
আজ আমার কী সৌভাগ্য, পৌঁছে গেলাম সঠিক সময়!
তোমার দয়া নিতে এলাম! দেখি, আছ তো বহালে।
ঠিকই শুনেছি, দোকান চালাচ্ছ বেশ সকালে, বিকালে।

মাণিক– রানাভাই, আমি ক্ষমা চাই। বুঝতে পারিনি, ভুল করেছি

‘এক ব্যাগ’ করে চেয়েছিলে হেতু হাজার টাকা দিয়েছি,
তারপর চেয়েছিলে ‘দশ কিলো’, পাঠাচ্ছি দশ কিলো চাল।
এখন জানি, দশ হাজার টাকা চেয়েছিলে, নহে মালামাল।

রানা– বুদ্ধিমান তুমি, বুঝতে যে পেরেছ সেজন্য শাবাশ তোমায়!
সবার সামনে সবকিছু কি তত খোলাখুলি বলা যায়?
আমরা কথা বলি সংকেতে, কারো জাগে না সন্দেহ তাতে।
এটা সেটা বলি, কিন্তু দেয়া-নেয়া চলে শুধুমাত্র টাকাতে।
কোথাও শুনেছ, চাঁদা কমে যায়? চাল দিলে চাঁদা দেয়া হয়?

(জনতার দিকে চেয়ে)

তোমরা কি জানো এরকম কিছু, একি আজব ব্যাপার নয়?

মাণিক– রানাভাই, চারিদিকে হাহাকার, আমি হয়েছি নিরুপায়!
বেচাকেনা নেই, হচ্ছে লোকসান, ঋণে ঋণে বড় অসহায়।

রানা– হ্যাঁ হ্যাঁ, নিরুপায়, অসহায়! তোমাদের উপরেই ভরসা;
চাঁদা না পেলে ‘ফকির হটাও’ প্রজেক্টের হবে কী দশা?
ভেবে দেখ, রংধনু ক্লাবের মাসিক অনুষ্ঠান হবে কী করে?
আমরা যাব কী করে রাজধানীতে এ শহরের কল্যাণ তরে?
হে মাণিক, গোটা দশ মাসের চাঁদা বাকি, এ চাঁদা চাই-ই!
দেবে এক লাখ টাকা, দিতে হবে, এছাড়া কোন গতি নাই!
আর কোন ফাঁকি-জুকি নয়, তোমাকে টাকা দিতে হবে আজ,
সন্ধ্যায় আসব- চলবে না চালবাজি, হবে নাকো ফাঁকিবাজ।

(হাতজোড় করে)

মাণিক– সব বুঝি রানাভাই, দাদাভাই, সত্যি, হাতে টাকা নাই।
বাকিতে করি বেচাবাচি, সামান্য আয়, কোনমতে দিন যায়
বাজার মন্দা, আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়, লাখ টাকা দেয়া দায়।
মাসে এক হাজার দিতেই খেলাম হিমশিম, করেছি কত ধার।
ধার শোধ হয়নি, এখন তুমি চাও দশ, অসাধ্য আমার।

রানা– বেটা তুমি একটা পেঁচু! কথা বলো সাত-পাঁচ, বড় গবেট!
বাজে কথা রাখো, তোমাদের টাকার উপরে আমাদের বাজেট,
আমাদের থাকা না থাকা। তুমি কি চাও কর্মকান্ড বন্ধ করি?
রাজনীতি ছেড়ে নামহীন, অর্থহীন জীবন নিয়ে বাঁচি, মরি?
এ হবার নয়, হতে পারে না।
তোমার কথা শুনে হাসি পায়।
বলো তুমি, টাকা বাঁচিয়ে লাভ হবে যদি দোকানটা পুড়ে যায়?
জেনে রাখো, আগুনে সব খোয়া যাবে, না পেলে টাকা আজ
চলবে না তোমার হেন-তেন। তুমি দেখছি বড্ড জাঁহাবাজ!

মাণিক– রানাভাই, দাদাভাই, সব কথা সত্য, খুলে দেখাই সিন্দুক?

রানা– আমি কী পাব সিন্দুক দেখে? দরকার হলে চালাব বন্দুক।
ওরে, বের কর পিস্তল, দে না এক ধাক্কা, পাক সে শিক্ষা
বেটা বাড়াচ্ছে হাঙ্গামা-ঝঞ্ঝাট, সে যে পাকামিতে পাক্কা!

(এক এক করে)

সকলে– -বদমাশ, বেয়াদব, চালবাজ, ধুরন্ধর! দেব চড় থাপ্পড়!
-যদি না দাও চাঁদা, মাথার এ খুলি উড়িয়ে দেব তোর!
-জ্বলবে আগুন! দোকান মিশবে ধূলায়, সব হবে ছারখার!
-তুমিও মরবে পুড়ে, সেসময় করো নাকো কান্না চীৎকার!
-শুনেছ, এক লাখ টাকা দেবে, দেখা হবে সন্ধ্যায়!
-ভাবো যদি চাঁদা দেবে না, নিও বৌ-এর কাছে শেষ বিদায়!

রানা– মাণকে, শেষ কথা, যেন কেহ এসব জানতে না পায়।
বেটা বলে কিনা বাজার মন্দা, নিরুপায়, বড় অসহায়!

(রানাদের প্রস্থান)

মাণিক– কে তুমি? তুমি আবার কী চাও?

(শ্যালক)

স্বপন– আমি স্বপন, দিদি কেঁদে বলল দাদাবাবুর কাছে ধাও।
সর্বনাশ দাদাবাবু! দাদাবাবু, আমি লুকিয়ে শুনেছি সব।
কাঁপছি আমি থর থর, বুক করছে দুরুদুরু- ধপ ধপ ধপ।
কী হবে এখন? আছে কী তোমার বাঁচার কোন উপায়?
পালাবে কি হেথা হতে? এক লাখ টাকা পাবে কোথায়?
দারোগা তোমার বন্ধু, এক মন্ত্রী তো তোমার আপন জন;
পুলিশে জানাবে কি? করবে কি মন্ত্রীকে টেলিফোন?

মাণিক– স্বপন, থামো তুমি, আগে পাইনি তো এমনতর ধমকানি।
বড়গাঁও-এ চাঁদা না দেয়ায় গুম হয়েছে দুই দোকানী।
লক্ষণ খুব ভাল নয়। আজ আমার না জানি কী হয়!

স্বপন– ঈশ্বর ডাকো, একবার নয়, বারবার; উপায় হবে নিশ্চয়।
আমার দিদিটা যে বিধবা হবে- আমার হচ্ছে ভীষণ ভয়।
চিন্তা দিদির জন্য, তুমি মরে যাও তাতে দুঃখ নাই–
তবে তুমি মরে গেলে দিদির রবে না যে কোন ঠাঁই!

মাণিক– আইনমন্ত্রী আমার বন্ধু, বলে, কোন জায়গা নেই জেলে।
কোটি টাকার জালিয়াতি আর নেতাদের খুনের মামলা পেলে
হাজার, লাখ টাকার জন্য পুলিশ-আদালত কান দেবে কেন?

স্বপন– দাদাবাবু, সারা দেশটা এক মগের মুল্লুক হয়ে গেছে যেন!

মাণিক– মন্ত্রী বলে, ‘চাঁদা তো তুচ্ছ ব্যাপার- যাও নেতাদের কাছে’।
রানা নিজেই নেতা, সরকারী লোক! কি আর উপায় আছে?
জানি, পুলিশেও চাঁদা দেয়, চাঁদা দেয়ায় নেই উঁচু নীচু।
ঈশ্বরকে ডাকছি, রাতদিন ডাকছি, আশাকরি হবে ভাল কিছু।

স্বপন– পুলিশও চাঁদা দেয়? দাদাবাবু, এখন সবাই বুঝি চাঁদা দেয়?

মাণিক– কেউ যদি করে কোন কারবার, তার থেকে পার্টি চাঁদা নেয়।
চাঁদা নেয় তারা শিক্ষকের কাছে, চাষা-কৃষককেও তারা ধরে।
চাঁদা দিতে হয় বাড়ি বানালে, কেউ অবসর নিলে পরে।
বিবাহ হলে তারা চাঁদা নেয়, শাকপাতা বেচলেও তাই।
জানি কে নেয় চাঁদা।
কত নেয়, কে পায়, তার হিসাব নাই!

স্বপন– দাদাবাবু, ওই দেখ, পন্ডিত আর দারোগা আসছে এখানে।

(কথা বলতে বলতে প্রবেশ)

পন্ডিত– এতো ক্ষমতা গুন্ডাদের হাতে,
কেন পারো না তাদের থামাতে?

দারোগা– পন্ডিত, বাল্যবন্ধু-
তুমি নিতান্ত অবুঝ, যদিও সবাই বিজ্ঞ মানে।
তুমি রানাদের ব্যাপারে কটু কথা বলো, এসেছে আমার কানে।
টাকা আসে, টাকা উড়ে যায়। রানাদেরও তো টাকা চাই।
যা চায়, এবার বেতন থেকে দিয়ে দাও, মিটমাট করো ভাই!

পন্ডিত– সামান্য বেতনের উপর চাঁদা- এটা অনিয়ম, অন্যায়!

দারোগা – জানি তুমি তর্করত্ন। সবকিছু পড়ে না তর্কের সীমানায়
ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম-অনিয়ম সব বদলায় সময় বদল হলে!

পন্ডিত– না, হয় না, হতে পারে না। তা হলে সব যাবে রসাতলে।

(প্রস্থানোদ্যত)

দারোগা– সামান্য, অতি সামান্য চাঁদা। আর করো না ঝামেলা।
লক্ষ তো নয়, বছরে ছয় হাজার টাকা!
এ জন্য লড়বে একেলা?

(পন্ডিতের প্রস্থান; মানিককে লক্ষ্য করে)

দারোগা– রানারা এসেছিল বুঝি? ভাবলাম দেখা করে শহরটা ছাড়ি।
যাব দুর্নীতিদমন সম্মেলনে, এবার ফিরব না তাড়াতাড়ি।

মানিক– রানাভাই এসেছিল, চাইছে লক্ষ টাকা। আজই দিতে হবে।

দারোগা– টাকা নেই? আজ যদি দিতে না চাও তবে দেবে কবে?
কারো কথা তো শুনবে না, কি করে তুমি টাকা জোগাবে?
ভেজাল না মিশাবে, জল, পাথর দিয়ে
ওজন বাড়াতে না চাইবে
জিনিস মজুত রেখে বলবে না
‘কিছুই নেই, এসো তিনদিন পর’।
পরে দাম বাড়াতে পারতে দশ গুণ-
এসব কত সহজ, সুন্দর!
এসব সবাই করছে। লোকে খোঁজে
জিনিসের সবচেয়ে কম দাম,
কেহ বোঝে না খাঁটি জিনিসের গুণ;
পরোয়া করে না ভাল নাম!
করবে না চোরা কারবারি, হবে না ধাপ্পাবাজ,
টিকবে কী করে?
একা ভাল রবে? ভেজাল-ঘুষ-চাঁদা-দুর্নীতিতে
দেশটা যে গেছে ভরে!

মানিক– দারোগা, তুমি যা বলতে চাও বলো, পারব না অসৎ হতে।
আগের মতো রানাদের একটু বলো,
যাতে বেঁচে যাই কোনমতে।

দারোগা– দেখ মানিক, বারবার বলো না এক কথা। এই শেষবার।
এসেছে হুমকি, সবেতে নাক গলালে আমার হবে ট্রান্সফার।
গিন্নী দিয়েছে এই ফর্দ, অটো-রিক্সায় এগুলো পাঠিয়ে দিও।
আমার বড্ড চিন্তা, কথা শোন না, নও তুমি নমনীয়।

(দারোগার প্রস্থান)

স্বপন– পুলিশের ক্ষমতা নেই, নেতাদের নীতি নেই,
গুন্ডাদের চাঁদা চাই।
দাদাবাবু, তুমি আর যারা চাঁদা দাও, তাদের তো টাকা নাই!

মানিক– যাক ওসব কথা, আমার মনটা ভেঙে গেছে,
দেখছি অন্ধকার।

স্বপন– দাদাবাবু চলো, রবি ঠাকুরের ‘আলো আমার আলো’
গানটি করি এবার।

মানিক– ‘আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন-ভরা’
...... না, সুরটা তো আসছে না স্বপন!

স্বপন– তাহলে বরং চাঁদার গানটি ধরি এখন!

দুজনে– চাঁদা আমার চাঁদা ওগো চাঁদায় ভুবন ভরা
চাঁদার দেশে বাস আমার চাঁদায় আধা মরা।
চাহে চাঁদা, চাহে ও ভাই প্রতি মাসে মাসে,
চাঁদা আমার মাথার জ্বালা থাকি সদা ত্রাসে।
আমার ধর্ম, আমার কর্ম, চাঁদার চিন্তা করা
চাঁদা আমার চাঁদা ওগো চাঁদায় ভুবন ভরা।...

নেপথ্যেঃ
দারোগার সুপারিশে এবার মানিক রক্ষা পেল,
হয়ত বা শেষ বারের মতো

....❋....❋....❋....

পেটুকের সঙ্গীতপ্রেম এবং শহুরে বনফুল

শেলী শাহাবউদ্দিন

বয়স হলে মানুষের অনেক হ্যাপা। দেহযন্ত্রগুলি যতই বিকল হতে থাকে খাদ্যদ্রব্যের সীমা, নিষেধাজ্ঞা ততই বাড়তে থাকে। বুড়োবুড়িদের নোলাও ততখানিই বেড়ে যায়। আমারও সেই অবস্থা হয়েছে! বুড়িকে বলি, আজ এটা খাব, কাল ওটা রেঁধে দাও- দুদিন পর সেসবও আর ভাল লাগে না। নিত্য নতুন ফরমাশ শুনে শুনে বুড়ি রেগে কাঁই!

এই যখন মুখযন্ত্রের অবস্থা তখন মনোযন্ত্রের আর দোষ কি! আগে সব গানই ভাল লাগত। আজকাল সেই ভাল লাগার একদিকে যেমন বর্ণবিভেদ শুরু হয়েছে- কোন কোন শ্রেণীর গান নিকৃষ্ট জাতের মনে হয়, তেমনি উচ্চ জাতের গানের মধ্যেও সব রোচে না। এক্ষেত্রেও মনচরিত্র যত খারাপ হচ্ছে নোলাও তত বড় হচ্ছে। ফলে ইদানীং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপর আমার শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। কত শত মেগা সাইজের ওস্তাদ আমেরিকায় গান গাইতে আসেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার এখানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন। সেখান থেকে রীতিমত ফলবান এবং ফলবতী সঙ্গীত-শিল্পী তৈরী হচ্ছে- এরকম অনেক জবরদস্ত ওস্তাদের গানও আমার পছন্দ হয় না। বড় লজ্জার বিষয়, কিন্তু সে কথা কে শোনে!। আমার বেকুব মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। আপনি হয়ত বলবেন- 'শুয়োরে চেনে কচু'। হয়ত তাই! কেউ যদি আমাকে গানের ব্যাকরণ ধরে বসেন তাহলেই আমার গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। গানের ব্যাকরণ দূরের কথা, কোন ব্যাকরণই আমি ঠিকমত জানি না। কাজেই কোন গান কী কারণে ভাল লাগে বা মন্দ লাগে সেসব জিজ্ঞাসা করে আমাকে লজ্জা দেবেন না। তবে ভাল বা মন্দ যে আমার লাগে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ঠিক ভোজন রসিক পেটুকের মতো! কোর্মা, পোলাও আমার মুখে রোচে না। টাকী মাছ দিয়ে বরবটি ভর্তা! আহা, এখনই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এইসব ভাল লাগার এক অপরূপ রূপ আমার মনে ধরা দেয়। সেই রূপ আমি বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু তাতে কার কী এসে যায়!

এইরকম সব দুর্বোধ্য কারণে রশিদ খানের চেঁচামেচি আমার ভাল লাগে, কিছুদিন লাগাতার রশিদ খান শোনার পর মনে হ'ল রোজ রোজ ভাজা ইলিশ আর কত খাওয়া যায়! এবার মুখ ফেরানো দরকার। খুঁজতে খুঁজতে দড়াম করে একদিন পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সন্ধান পেলুম। কয়েক মাস বেহুঁশের মতো কাটালুম। এক সময় মনে হ'ল রোজ দুবেলা এভাবে রসমালাই খাওয়াটা ঠিক নয়। স্বাদের ব্যাপারটা ছাড়াও মনের ভেতরে ডায়াবেটিসের আক্রমণ হতে পারে। অনবরত চিনি খেলে শরীর আর চিনি সইতে পারে না।

তা, মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত! আমার দৌড় ইউ টিউব অবধি গিয়েই শেষ। সেখানে আরো দু-একবার ভীমসেন যোশী শুনেছি। আমার মস্তিষ্কে কিছুই ঢোকেনি। প্রথমবার বিদেশী খাবার খেয়ে যেমন গাধার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলুম, সেই অবস্থা আর কি! হঠাৎ পন্ডিতজী মারা গেলেন। ভাবলাম সব ফুরিয়ে যাবার আগে আর একবার চেখে দেখি। ভয়ানক কান্ড! এবার চাখতে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলুম। আমার নোলা আধহাত লম্বা হয়ে গেল, একটা খাদকে পরিণত হয়ে গেলুম! মাসের পর মাস একই জিনিস গিলে যাচ্ছি, অরুচির কোনও লক্ষণ নেই। কিছুদিন পর মনে একটা ভয় ঢুকল। সুষম খাবারের একটা ব্যাপার আছে! স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কিছুদিন তাবড় তাবড় অন্য ওস্তাদদের পরিবেশনা চেখে দেখলুম, কোনটাই আমার মুখে (মনে) রোচে না। সেই দুর্বোধ্য রাসভ লক্ষণ!

হঠাৎ পন্ডিতজীর গুরু ওস্তাদ আবদুল করিম খানের খেয়াল শুনলুম। বহু প্রাচীন গুরু, তেমনি প্রাচীন রেকর্ড। তবু ভাল লেগে গেল। মনে হ'ল পুরনো মদের মতই নেশা ধরানো মাল! গুরু শিষ্য মিলে আমাকে পাঁড় মাতাল বানিয়ে ছাড়লেন। একজন পরিবেশন করেন কিসিম কিসিমের গরম গরম কাবাব আর একজন গ্লাসে ঢালেন 'শারাবান তাহুরা'!

একবার সরকারী লঞ্চে রিলিফের কাজে যাচ্ছিলুম। নদীর মাঝখানে জেলেদের ধরা তাজা ইলিশ পেয়ে গেলুম। লঞ্চেই রাঁধা হ'ল। সে ইলিশ যে না খেয়েছে সে কোনদিন জানবে না তার সাথে পশ্চিম দেশে এই বরফ জমাট পুরনো ইলিশের কী তফাৎ! সামনে বসে গান শোনা আর রেকর্ড করা গানেও খানিকটা তফাৎ আসেই। তাই ধারে কাছের শহরে গানের অনুষ্ঠানের খবর পেলে আমিও গেঁয়ো তাড়িখোরের মতো অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে নতুন আবিষ্কৃত তাড়িখানায় হাজির হই। পেটুক স্বভাবের কারণে আমি তেমন স্বাদ পাই না এসব ব্যাপারে। এসব জায়গায় অধিকাংশই ট্র্যাক-শিল্পী। সেটাও গেঁয়ো পেটুকের কাছে বিদেশী খাবার। কিছু কিছু ভাল স্থানীয় শিল্পী আছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই মনে হয় নিজের গলার ওপর ভরসা করতে পারেন না। কারো কারো গলা খুবই ভাল, তবু তাঁদের সব আস্থা যন্ত্রের ওপর, ট্র্যাকের ওপর। বাদ্যযন্ত্রের সিংহ-গর্জন যখন শুরু হয় তখন মনে হয়- বাপ্‌রে, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে এসে পড়েছি যেন! এইরকম এক আসর থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। সেই থেকে কানে কম শুনি। মন্দের ভাল এই যে বুড়ির শাপ শাপান্ত আজকাল একটু কম শুনি। তবে তাকিয়ে দেখলে তাঁর আগের মতো রণচন্ডী মূর্তি দেখে নিশ্চিন্ত হই। বুড়ি আমার আগে নিশ্চয়ই মরবে না! আমার ভাত রাঁধার ব্যবস্থা পাকা।

এভাবে প্রায়ই গান শুনতে গিয়ে শব্দাসুরের ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আসি। ধাক্কার ঠেলায় খাঁটি বাঙালি যা করে আমিও তাই করলুম। একটা কবিতা লিখে শব্দাসুরকে একহাত দেখে নিলুম।

কিন্নরী গান গায় কিন্নরী স্বরে,
যন্ত্রদানব তার গলা চেপে ধরে।
এ যুগের অসুরেরা অজর, অমর,
পরাজিত বীণাপাণি, স্তম্ভিত ঈশ্বর!

দুই

এইসব যুদ্ধ বিগ্রহ যখন চলছে তখন একদিন পরমাশ্চর্য এক খবর পেলুম। ভদ্রলোকের নাম সাজেদ চৌধুরী। ২০০৮ সালে লস্ অ্যাঞ্জেলসে এক সাহিত্য সম্মেলনে গেছি। সাহিত্য ছিল উপলক্ষ্য। আমি গেছিলুম ভুনা খিচুড়ির গন্ধ পেয়ে। সাজেদ সাহেব

আমাকে বিমান বন্দর থেকে সংগ্রহ করে তাঁর গিন্নীর কাছে পেশ করলেন। সাজেদ-গিন্নী অনেকদিন সমঝদার খাদকের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ডেকচি ভর্তি ভুনা খিচুড়ি, মুরগীর মাংসের ঝোল, মাছভাজা, আর তার সাথে বাঙালি নারীর রহস্যময় আতিথেয়তা মিশিয়ে আমাকে সাধ মিটিয়ে খাওয়ালেন। তারপর সাজেদ সাহেব আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

পরদিন থেকে সাজেদ সাহেবকে দর্শক হিসেবে পেয়েছি। তখন ভেবেছি আতিথেয়তা, অমায়িকতা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো- এ সবই তাঁর গুণ। এখন বিস্মিত হয়ে শুনি তিনি নাকি কবিতা লেখেন। কবিতা অবশ্য প্রায় সব বাঙালিই লেখেন জীবনের কোন না কোন সময়ে। যে বাঙালি কবিতা লেখে না সে বাঙালি কিনা সে বিষয়ে আমার মনে একটা খটকা আছে। আমার মতো পেটুকও কবিতা লেখে। গত বৈশাখে ইলিশ আর পান্তাভাত বিষয় নিয়ে একটা নালঝরা কবিতা লিখেছি।

সাজেদ সাহেব কবিতা লেখেন কেউ জানে না। কী তাজ্জব কান্ড! ২০১৩ সালের বারোই নভেম্বর লস্ অ্যাঞ্জেলস্ শহরে একটি একক গানের অনুষ্ঠান হবে। সেখানে বম্বের পন্ডিত গিরিশ চ্যাটার্জী সাজেদের কবিতায় সুর দিয়ে গান গাইবেন। আমরা নিমন্ত্রিত। টিকিট কিনে রেখেছি। যথাসময়ে অনুষ্ঠানে হাজির হলুম। গাঁয়ে থাকি, সেখান থেকে গাড়িতে চার ঘন্টার পথ। হলে গিয়ে দেখি টিকিটগুলো বাসায় ফেলে এসেছি। কী কান্ড! কী কান্ড! জটিল সব খাদ্য-চিন্তায় দিনরাত গলদঘর্ম হচ্ছি, এসব তুচ্ছ বিষয় আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। কাঁচুমাচু হয়ে সাজেদ সাহেবকে ঘটনা জানাতেই তিনি স্বভাবসুলভ অমায়িক হেসে আমাদের 'টিকিটহারা' অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে ঢুকিয়ে দিলেন। ছোট হল, তবু সব আসনগুলি ভরেনি। লস্ অ্যাঞ্জেলসে যাঁরা গান করেন আর শোনেন তাঁদের প্রায় কাউকেই দেখলুম না। তদুপরি লোকজন এত কম দেখে ভড়কে গেলুম, অনুষ্ঠান ঠিকমত হবে তো! ভড়কে গেলে আমার খিদে বেড়ে যায়। খাই খাই শুরু হ'ল। অনুষ্ঠান শেষ হবে অনেক রাতে, ততক্ষণে খাবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে আসবার সময় ধারে কাছে কোন খাবার দোকানও দেখিনি। রাতে না খেলে পরদিন পর্যন্ত বাঁচব কি?

কিন্তু সাজেদ সাহেব আমার মৃত্যু ঘটায় ব্যাঘাত ঘটালেন। তিনি জানালেন যে প্রচুর 'বালুকা ডাইনি'র (স্যান্ডউইচ) ব্যবস্থা আছে। আমি বেশ খানেক ডাইনি খেয়ে ফেললুম। তবু অতৃপ্তি রয়ে গেল। বালুকা ডাইনি খেয়ে আমার মতো ভোজন রসিকের তৃপ্তি হয় না। আমার বুড়ি গোটা দুই ডাইনি খেয়ে হাঁসফাস করতে লাগল।

লস্ অ্যাঞ্জেলসের বাংলাদেশ কনসোল্ গান উদ্বোধন করবেন। তিনি সব সময় সারা অনুষ্ঠান বসে থেকে শোনেন। সেদিন উদ্বোধন করে চলে গেলেন। গান শোনার জন্য আর অপেক্ষা করলেন না।। তাঁর বয়সে খাদ্যাভ্যাস আমার মতো হবে এমন কোন কথা নেই, তবুও তিনি যে এসেছিলেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কিন্তু লস্ অ্যাঞ্জেলসের রথী-মহারথীদের কাউকে দেখলুম না। আবার ভয় হ'ল। আজকের ভোজসভায় কুঁচো চিংড়ির ঝোল ছাড়া আর কিছু জুটবে বলে মনে হ'ল না।

যথা সময়ে পন্ডিত গিরিশ চ্যাটার্জী গাইতে বসলেন। দীর্ঘ দেহ বাঙালি। গিরিশ চ্যাটার্জী বাঙালি হয়েও বম্বের সঙ্গীত জগতে জায়গা করে নিয়েছেন। সেখানে সিনেমায় তিনি একজন নিয়মিত সঙ্গীত পরিচালক। সঙ্গে সুরকার, তাঁরই এক ভাই। সাজেদের গানেও সুর দিয়েছেন এই ভাই। বম্বের কাজের চাপে কলকাতার সাথে তাঁর আর তেমন যোগাযোগ নেই; কিন্তু বাংলা গানে কাজ করবার ক্ষুধা তাঁর রয়ে গেছে। সাজেদের গীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের সেটাও একটা কারণ। চার পুরুষ সঙ্গীত পরিবারের সন্তান এই বিখ্যাত শিল্পী। তাঁর হাতেখড়ি হয় বাবা পন্ডিত তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং মা দীপালি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। আরো যাঁদের কাছে তিনি গান শিখেছেন তাঁদের অন্যতম পন্ডিত ভীমসেন যোশী। ঢাকার বিখ্যাত ফকরুদ্দিন বাবুর্চির ছেলের রান্না বিরিয়ানী যাঁরা খেয়েছেন, তাঁরা হয়ত ফকরুদ্দিন বাবুর্চির রান্নার স্বাদ কিছুটা ছেলের রান্নাতেও উপভোগ করবেন। তেমনি গিরিশ চ্যাটার্জীর গানেও ভীমসেন যোশীর আভাস পাওয়া যায়।

গান শুরু হ'ল। বসে বসে শুনছি আর দেখছি জ্যান্ত ওস্তাদের গান কতকাল পরে। মনে হ'ল দীর্ঘ যাত্রার পর ক্লান্ত শরীর আর রাক্ষুসে খিদের মুখে গরম ভাতের সাথে গরম গরম ঘন ডাল আর ঝাল ঝাল আলুভর্তা দিয়ে পেটপুরে খাওয়া সারলুম। এই শিল্পীর গান আমি পরেও লস্ অ্যাঞ্জেলসের অন্য অনুষ্ঠানে শুনেছি। সে ছিল চিকিৎসকদের অনুষ্ঠান। অনেক লোকজন পরিপূর্ণ বড় হলে বড় অনুষ্ঠান। সেখানে খাওয়া দাওয়ার দেদার ব্যবস্থা, কাজেই সঙ্গীত রস আর রসনা মিলে সেদিন আমার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু প্রথম অনুষ্ঠানের গুরুত্ব গভীর! সে অনুষ্ঠানের সবগুলি গান ছিল সাজেদ চৌধুরীর লেখা। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিতির দৈন্য নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সঙ্গে সাজেদ একটু দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কাউকে দায়ী করেননি। আমার দুঃখ হয়েছিল সমাজের প্রতি, গুণীজনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার স্বরূপ দেখে। দুঃখ হয়েছিল তাঁদের জন্য, যাঁরা অনুপস্থিতির কারণে বঞ্চিত হয়েছেন, মর্যাদা হারিয়েছেন।

আশ্চর্য! শহরে বনফুল ফুটে আছে, কি মিষ্টি গন্ধ তার! কেউ এসে সেই গন্ধের মাধুর্য গ্রহণ করল কিনা তাতে বনফুলের কিছুই আসে যায় না। সে তার আপন স্বভাবে নিভৃতে সুগন্ধ বিলিয়ে যায়। চাইলে আমার মতো পেটুকও সেই গন্ধ পায়।

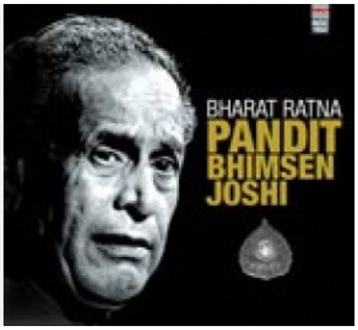

স্টিফেন ক্রেন

অমানিতা সেন

আমেরিকার লেখক স্টিফেন ক্রেন-এর মাত্র আঠাশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনকে অনেক জীবনীকার 'আগুনের জীবন' বলে বর্ণনা করেছেন। সাফল্যের খ্যাতির চূড়া থেকে দারিদ্র ও দেনার অবস্থান, তাঁর জীবন ছিল বিপুল বৈপরীত্যের মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য রেড্ ব্যাজ্ অফ্ করেজ্' রচিত হয় মার্কিন গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায়। এক বারবনিতার পক্ষে পুলিশের বিরুদ্ধ সওয়াল করায় তার বিরুদ্ধে তৈরী হয়েছিল প্রবল জনমত। কিউবাতে যুদ্ধপ্রতিবেদক হয়ে যাওয়ার পথে তাঁর জাহাজডুবি হয় এবং ডিঙিতে তাঁর ভাসমান থাকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি রচনা করেন বিখ্যাত ছোট গল্প, 'দ্য ওপেন বোট'।

কবিরূপে ক্রেনের আত্মপ্রকাশ 'দ্য ব্ল্যাক্ রাইডারস্ অ্যান্ড অদর লাইন্স্' গ্রন্থে, যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ছিল বক্তব্যে ও পরিবেশনায়। মুক্ত ছন্দে কবিতাগুলি ছিল নামহীন। রূপকের ব্যবহার, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিরোধিতা তাঁর কবিতাকে সমসাময়িক অন্য সকলের কবিতা থেকে আলাদা করে তুলতে পেরেছিল। অনেক কবিতায় দুটি চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন এক নাটকীয়তা আনে যখন তাদের মতবাদ পরস্পর বিরোধী হয়। তার নিজস্ব জীবনবোধে ভরপুর কবিতাগুলো এখনও প্রাসঙ্গিক, ভাবনায়, উপস্থাপনায়, বোধের চিরকালীনতায়। ঈশ্বর ও ধর্মচেতনা, সমাজ ও তার সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী, এবং ভালবাসা ও তার প্রাসঙ্গিকতা- এ সবই ছিল এই বইয়ের উপপাদ্য। কখনও মনে হয় এই কবিতাগুলো যেন ছিল তাঁর না-বলা কথার প্রকাশ, তাঁর অব্যক্ত ভাবনার মুক্তির প্রাঙ্গণ। কবিতাগুলি তাই অনেকটা যেন তাঁর নিজের সাথেই কথোপকথন। ব্যক্তি-মনের ভয়, দ্বেষ, ভালবাসা, কুণ্ঠা, জীবন ও ঈশ্বর নিয়ে দ্বন্দ্ব সবকিছুই কয়েকটা সহজ কথায় প্রকাশ করে দেওয়া। সে যুগের তুলনাই এই প্রকাশ ছিল বড়ই ব্যতিক্রমী। কবি নিজে কখনও এই মুক্ত ছন্দের কবিতাগুলিকে কবিতা বলে পরিচয় দেননি। এগুলোর পরিচয় তাঁর কাছে ছিল কয়েকটি পঙক্তি মাত্র। কিন্তু বহু গবেষকের মতে ওই বৈপ্লবিক পঙক্তিগুলির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ফরাসী সিম্বলিস্‌ম্ ও চিত্রকল্প, যা কিনা হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব কবিতার মূল উপপাদ্য। এই অনুবাদ গুচ্ছের কবিতাগুলি অবশ্য বেছে নেওয়া হয়েছে কবির এক দুর্লভ অথচ সহজ, সরল ভালবাসার প্রতি এবং প্রেমের এক অভাবনীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থার পরিচয় ধরে ফেলার প্রচেষ্টায়। ধর্ম, জীবন ও সমাজের সীমাবদ্ধতার গ্লানি ও যন্ত্রণার আড়ালেও কবি তাই কখনও তাঁর প্রেমিক সত্তাকে হারিয়ে ফেলেননি। তাঁর কলমের কালিতে তাই সর্বত্র সেই প্রেমের প্রকাশ। সেই প্রেমের নানা রূপ ছড়িয়ে আছে এই ভিন্ন স্বাদের কবিতাগুলির গায়ে।

হাজার দ্বিধা, হিংস্র সমাজের কুটিল বাধা, সব মুছে যায় যদি সহজ, সরল ভালবাসা ফিরে পায় প্রেম। অনাবিল এই প্রেমের ওপর বিশ্বাস কবির কখনও থামেনি। 'আর তুমি আমার ভালবাসা' কবিতায় আমরা দেখি এই বিশ্বাস আর ভয়ের দ্বৈত চিত্র। কবিতাটির আপাত স্ববিরোধী বক্তব্য অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে আসলে এই কবিতাটি দুই প্রেমিকের কথোপকথন। সব মিলিয়ে একটি আত্যন্তিক সুখানুভূতি জাগানো কবিতা, যা মানুষকে বাধ্য করে ভালবাসার বিবর্ণ চিবুক ঘুরিয়ে ধরে আরও একবার আলোয় ফিরিয়ে দেখতে তার চির-উজ্জ্বল রূপ। সেখানেই কবির জয়, তাঁর কবিতার সার্থকতা।

'যদি এই বিপুল বিশ্ব' কবিতাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বব্ ডিলান্ সহ আরও অসংখ্য গীতিকারের নিবিড় প্রেমের অভিব্যক্তি সম্পন্ন বহু গান। পাঠক পরিচয় পান কবির প্রেমিক সত্তার। যে ভালবাসা পেলে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়; যে 'ভালবাসা পেলে' কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন 'সব লন্ডভন্ড করে চলে যাব,' সেই ভালবাসার প্রতি বিশ্বাস এই কবিতাটির সমগ্র শরীরে গাঁথা। আমাদেরও বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু পাওয়া না-পাওয়ার প্রেমের খেলায় বেদনা কি নেই? নিঃসঙ্গ প্রেমের অব্যর্থ বিবরণ 'Love Walked Alone' কবিতায়। সমকালীন যুগে রুশ কবি ইরা ইভানোভার কবিতায় আমরা বার বার দেখি এই কেটে ছিঁড়ে যাওয়ার অভিব্যক্তি। ভালবাসার পথ যে সত্যিই বন্ধুর। একই কথা কবি বলেছেন 'তরল লাভার স্রোতে' কবিতায়। অথচ এই কবিতাও কিন্তু ভালবাসারই কবিতা। কবি জানেন love entails pain. এবং এই ভালবাসার যৌক্তিকতা, সত্যতা বা অন্তর্গত অসত্যতা, সেই দরুন উদ্ভূত তিক্ততা, শঠতা সবই সত্য। তবু মানুষ ভালবাসে। তবু কবি লেখেন। রক্তের অক্ষরেই লেখেন। কারণ ভালবাসা প্রকাশ চায়, হৃদয়ের নরম বা খাতার নিভৃত পাতায়। কলমের কালো কালি নেচে ওঠে চিরন্তন লাস্যে।

সমাজের নিরিখে যে ব্রাত্য, পরিত্যাজ্য, পাপী- সে কি সত্যিই পাপী? শঠ, ক্রূর, আপাত-পাপী মানুষেরও যে এক সহজ প্রেমিকা থাকতে পারে, 'হুঁশিয়ার! নষ্ট মানুষের কবর এখানে' কবিতায় সে কথাই বলে কবি কিন্তু উচ্চারণ করেছেন এক অত্যন্ত সাহসী ও চিরন্তন বক্তব্য। আর একজন মানুষকে বিচার করার কি সত্যিই কোন অধিকার আমাদের আছে? কৌলীন্য, মর্যাদা, জাতপাতের বাইরে গিয়ে যারা ভালবাসতে চায় তাদের যন্ত্রণার কথাও যেন কবি এখানে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বলতে চেয়েছেন পাপকে ঘৃণা করো, সাজা দাও, পাপীকে করো না, সে শুধু পাপকেই ডেকে আনা হবে। ভালবাসাকে দেখার এ এক অন্য নিরিখ।

প্রেমাস্পদকে নিজের করায়ত্ত করার মধ্যে প্রেমের সার্থকতা নেই। প্রেমের সত্যিকারের রূপ ভালবাসতে পারার মধ্যেই নিহিত, সেই কথাই বলা হয়েছে 'এদিক ওদিক অনেক খুঁজলাম আমি' কবিতায়। প্রেমিকার যে রূপ প্রেমিকের মনের মাধুরী দিয়ে রচনা হয় সে সৌন্দর্যের, সেই মাধুরীর কোন শেষ নেই। ঐকান্তিক প্রেম কিছু ফিরে চায় না, নিজের করে ফেলতে চায় না, শুধু ভালবাসতে চায়।

'একবার একটি মানুষ এসে বলল' কবিতায় এক ভিন্ন ভালবাসার কথা। নিখিল বিশ্বের প্রতি এই ভালবাসা। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এই অনুকম্পার এক কণা আমরা সবাই। একে অপরকে

ভালবাসা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তবুও যুদ্ধবাজ, কুচক্রী, ক্ষমতালোভী মানুষ বশ করে ফেলে সমষ্টির চেতনা। রাষ্ট্র, রাজ্য, ধর্মের অজুহাতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ অযাচিত করে হাজার নিযুতের ধ্বংসের আয়োজনে মাতে, মাতায়। অথচ সহজ ধর্মের সহজিয়া অনুরাগে কিছু মানুষ বারবার মানবকে একত্র করতে চেয়েছেন শান্তির পতাকার নিচে। শোনেনি মানুষ, বোঝেনি, অথচ বোঝা সহজ ছিল, খুব সহজ। শুধু ভালবাসতে জানতে হবে, আর কিছু না। ঘৃণা হয়ে প্রেমের ছায়ার নিচে নীল হয় যে, সেও ভালবাসাই তো। ফেরানোর অপেক্ষায় শুধু।

ধর্মের নামে বহু রক্ত ঝরেছে। ইতিহাস সাক্ষী, সাক্ষী এই সাময়িক বিশ্বও। কিন্তু ঈশ্বরের সান্নিধ্য, তাঁর ভালবাসার কণ্ঠস্বর তো বুকের নিভৃতে শুনতে হয়। মন্দির, মসজিদ, গির্জার সদম্ভ ঘোষণায় বা অপ্রতিবাদী বশ্যতায় লেখা নেই ঈশ্বরের নাম। সে নাম শুনে নিতে হয় 'নিশ্চুপ বারান্দায়'। বুকের গভীরে জাগাতে হয় সেই ভালবাসার নরম। তবুও কবির ভাষায় 'শোনেনি মানব সেই গান, এখনও বুকের নিভৃতে তবু...'

••••❈••••❈••••❈••••

The Black Riders And Other Lines
XL
Stephen Crane

And you love me
I love you.
You are, then, cold coward.
Aye; but, beloved,
When I strive to come to you,
Man's opinions, a thousand thickets,
My interwoven existence,
My life, Caught in the stubble of the world
Like a tender veil-
This stays me.
No strange move can I make
Without noise of tearing, I dare not.
If love loves,
There is no world, Nor word.
All is lost
Save thought of love
And place to dream.
You love me?
I love you.
You are, then, cold coward.
Aye; but, beloved-

৪০
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

আর তুমি আমায় ভালবাস
আমিও বাসি তোমায়
তোমাকে কাপুরুষ বলা যায় তাই।
কাপুরুষ, প্রেয়সী তবুও।

তোমার কাছে আসার লড়াইয়ে
মানুষের মন্তব্য, গন্ডারের চামড়ায়
রুখে, আমার ঠাস বুনটের অস্তিত্ব,
ফালা ফালা হয়।
মৃদু ওড়না যেন, আটকে গেছে,
পৃথিবীর রুক্ষতার কাঁটা তারে।
আমি থমকে থাকি তাই।

কেননা কোনও নিষ্পাপ গতিবিধিই
আর করতে পারব না আমি।
ছিঁড়ে ফেলার রক্তাক্ত
আওয়াজ এড়ানো যাবে না আর।
সাহস হয় না আমার।

যদি প্রেম ভালবাসে,
পৃথিবী থাকে না আর;
শব্দ মুছে যায়,
সব হারানোর নিঃশেষ অভিমানের
গভীরেও, জাগে শুধু ভালবাসার স্বপ্ন।

তুমি কি ভালবাস আমায়?
আমি বাসি
আর তাই, আমিও কাপুরুষ,
কাপুরুষ, প্রেমিক তবুও।

••••❈••••❈••••❈••••

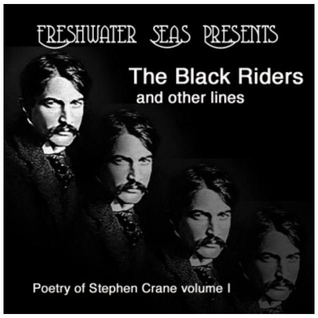

The Black Riders And Other Lines
X
Stephen Crane

Should the wide world roll away,
Leaving black terror,
Limitless night,
Nor God, nor man, nor place to stand
Would be to me essential,
If thou and thy white arms were there,
And the fall to doom a long way.

১০
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

যদি এই বিপুল বিশ্ব
ভেসে যায় একদিন;
পড়ে থাকে তীব্র, কালো
বিভীষিকার রাত-
ঈশ্বর, মানুষ কিংবা পায়ের নিচের জমি,
কিচ্ছু চাই না আমার।
শুধু যদি তুমি আর তোমার মায়ার
হাত না হারাই আমি,
আর, অনিবার্য ধ্বংস থাকে
কিছুটা দূরে,
অন্তত কিছুটা...

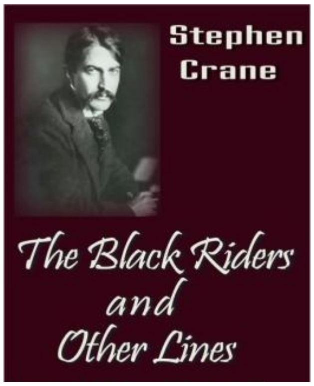

The Black Riders And Other Lines
XLI
Stephen Crane

Love walked alone.
The rocks cut her tender feet,
And the brambles tore her fair limbs.
There came a companion to her,
But, alas, he was no help,
For his name was heart's pain.

৪১
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

ভালবাসার পথ ছিল নির্জন,
বান্ধবহীন, একলার পথ,
হিংস্র পাথর কেটেছে
ওর নরম পায়ের মাংস;
আর কাঁটাগাছ
ছিঁড়ে ফালি ফালি করেছে
নিটোল বাহুর পেলব।
তারপর একদিন সঙ্গ দিল কেউ।
খুব সুবিধে হ'ল না অবশ্য,
কারণ সাথীর নাম
রক্তাক্ত হৃদয়...

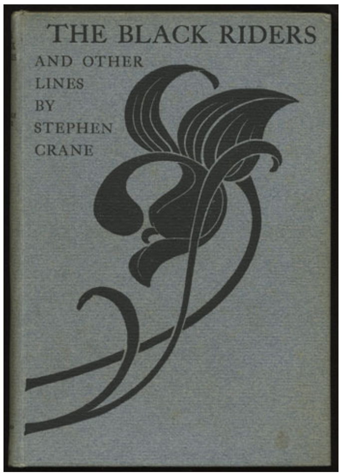

The Black Riders And Other Lines
XLVI
Stephen Crane

Many red devils ran from my heart
And out upon the page,
They were so tiny
The pen could mash them.
And many struggled in the ink.
It was strange
To write in this red muck
Of things from my heart.

৪৬
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

তরল লাভার স্রোতে অগ্নিবর্ণ,
কুচক্রী শয়তান সব,
আমার বুক থেকে
ছিটকে পড়ল খাতার পাতায়।
কলম টিপে মারা গেল কিছু,
কিছু হাবুডুবু খেল কালির স্রোতে।
অদ্ভুত লাগে, এভাবে,
এই রক্তাক্ত কাদার অক্ষরে-
হৃদয়ের কথা লিখতে।

....❋....❋....❋....

The Black Riders And Other Lines
XXV
Stephen Crane

Behold, the grave of a wicked man,
And near it, a stern spirit.
There came a drooping maid with violets,
But the spirit grasped her arm.
"No flowers for him," he said.
The maid wept:
"Ah, I loved him."
But the spirit, grim and frowning:
"No flowers for him."
Now, this is it-
If the spirit was just,
Why did the maid weep?

২৫
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

‘হুঁশিয়ার!
নষ্ট মানুষের কবর এখানে’।
আর পাশে দাঁড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরী।
নত মুখে মানুষী এক
এল সে ফুলের পসরা নিয়ে।
তার হাত আচমকা ধরে ফেলে
প্রহরী, ‘কোনও ফুল
নেই ওর প্রাপ্য, পাপী ও’।
ক্রন্দসী নারীর আকুতি,
‘ভালবাসি যে ওকে’...
কিন্তু কঠিন, নিস্পৃহ প্রহরী,
নিয়মে অটল, ‘কোনও ফুল
প্রাপ্য নেই পাপীর’।
প্রশ্ন তাই... প্রহরী সঠিক
হয় যদি, তাহলে কেন রোরুদ্য
এই নিবিড় রমণী?

....❋....❋....❋....

The Black Riders And Other Lines
VIII
Stephen Crane

I looked here;
I looked there;
Nowhere could I see my love.
And-this time-
She was in my heart.
Truly, then, I have no complaint,
For though she be fair and fairer,
She is none so fair as she In my heart.

৮
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

এদিক ওদিক
অনেক খুঁজলাম আমি।
ওকে দেখতে পেলাম না;
আমার ভালবাসার জন,
সেই মেয়ে, এবারে আর
খুঁজে পেলাম না তাকে।

কিন্তু ... এবারে,
হৃদয়-নিভৃতে পেলাম ওকে।
এবারে তাই কোনও অভিযোগ
নেই আর; কারণ, যদিও
অনুপম ওর অপার্থিব রূপ,
হয়ত নিবিড় আরও, নিভৃত সুষমা;
তবু আমার হৃদয় অন্ধকারে
যেই আলো ওর মুখে জাগে,
তত আলো দেখেনি বসুধা।

The Black Riders And Other Lines
XXXIX
Stephen Crane

The livid lightnings flashed in the clouds;
The leaden thunders crashed.
A worshipper raised his arm.
"Hearken! Hearken! The voice of God!"
"Not so," said a man.
"The voice of God whispers in the heart
So softly
That the soul pauses,
Making no noise,
And strives for these melodies,
Distant, sighing, like faintest breath,
And all the being is still to hear."

৩৯
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের আলোয়
উদ্ভাসিত হ'ল তীব্র মেঘ, আর
মেঘমন্দ্র সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ
শুনে চীৎকার করে উঠল
এক উপাসক, 'শোন শোন,
ঈশ্বরের আওয়াজ শোন'।

'না' বলল লোকটি।
'ঈশ্বরের কথা, বুকের গোপনে
লুকনো নিঃশ্বাসের মতো শোনা
যায়; সোনা ঝরা সৈকতে,
ঝাউবনের নরম, নির্জন
স্বপ্নের মতো সেই স্বর,
স্তব্ধ করে ক্ষুধিত আত্মার
গতি। নিশ্চুপ বারান্দায় একা
শুনে নিতে চায় সেই গান।

হাজার আলোকবর্ষ পেরিয়ে
সেই দীর্ঘশ্বাস, ভালবাসার
স্বচ্ছ ওঠা নামা, ক্লান্তির বুক
ছুঁয়ে বলে দেয় ''ভালবেসো''।

শোনেনি মানব সেই গান
এখনও বুকের নিভৃতে তবু...'

The Black Riders And Other Lines
V
Stephen Crane

Once there came a man
Who said,
"Range me all men of the world in rows."
And instantly
There was terrific clamour among the people
Against being ranged in rows.
There was a loud quarrel, world-wide.
It endured for ages;
And blood was shed
By those who would not stand in rows,
And by those who pined to stand in rows.
Eventually, the man went to death, weeping.
And those who staid in bloody scuffle
Knew not the great simplicity.

৫
অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

একবার একটি মানুষ এসে বলল,
'পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমি
সারিবদ্ধ চাই'।
আর অমনি ভীষণ হট্টগোল বেঁধে গেল।
কেউ আর লাইনে দাঁড়াবে না।
ভীষণ ঝগড়া, বিশ্ব জুড়ে দাবানল,
বহু যুগ চলল সেই যুদ্ধ।
বহু রক্ত ঝরাল, যারা লাইনে
দাঁড়াতে চাইল না কোনও দিন;
এবং যারা সারা জীবন আকুতি
জানিয়ে গেল, পঙক্তিবদ্ধ হবে বলে;
শেষ পর্যন্ত লোকটি মারা গেল,
কাঁদতে কাঁদতে...
আর ওরা, যারা সারা জীবন
কাটিয়ে দিল, অর্থহীন রক্তপাতে,
বুঝলই না কী সহজ রাস্তা খোলা
ছিল, ওদের চোখের সামনে।

দাঁড়িয়ে আছো তুমি
কমলপ্রিয়া রায়

ভোরের বেলায় পাখির গানে
ভরে ওঠে মন,
তোমার সাথে আমার দেখার
সেই তো শুভক্ষণ।
রবির কিরণ গাছের পাতায়
ফুলের বুকে লতায় লতায়
কেমন করে ঝর্ণাধারায়
করে উজ্জীবন!
আমার মনেও দোল দিয়ে যায়
তোমার মধুর গান।

মধ্যাহ্নের অলস দুপুর
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
তোমার বাঁশির অজানা সুর
খোঁজে চিরন্তন।
আমার মনের মধ্যিখানে
হৃদকমলের গহন বনে
সেই সুরের হাওয়া হঠাৎ এসে
জাগায় অনুরণন।

সাঁঝের ছায়া যখন পড়ে
অন্ধকারের নীরব ঘরে
শান্ত হয়ে জ্বালাই আমি
ছোট্ট প্রদীপখানি,
তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছো তুমি!
কেমন করে তুমি এলে
আমার ডাকে সাড়া দিলে
ভেবে অবাক হই!
তোমার আশিস দিয়ে মোরে
প্রাণের মাঝে সুরভি ভরে
করলে আমায় জয়ী!

পুতুল খেলা

নন্দিতা ভাটনগর

সাবেকী বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলেন এক বনেদী পরিবারের শেষ জীবিত পুত্রবধূ সুহাসিনী। উদাস চোখে চেয়েছিলেন সামনের রাস্তাটার দিকে। তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন সেই কোন যুগে যখন মেয়ে-বৌদের একা কোথাও বেরোবার হুকুম ছিল না। অন্দর মহল আর বার মহলের মাঝখানে ছিল এক নিষেধের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের দুদিকে থাকত দূত আর দূতীদের আনাগোনা- ছোট-বড়, মেজ-সেজ, দাসী আর হুঁকোবরদার, বেয়ারা, জমাদার আর চাকরদের খাস রাজত্ব ছিল সেখানে।

সুহাসিনীর মনে পড়ে তার ছ'বছর বয়সটাকে- যখন তাঁকে গয়না-গাঁটি শাড়ি-জ্যাকেটের ভারে নুয়ে পড়ে, বন্ধ ফিটনে চেপে দাসীর হাত ধরে আসতে হ'ত এ বাড়িতে। ভাবী শ্বশুরবাড়িতে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার এই ব্যবস্থাটি করেছিলেন দুই পরিবারের গুরুজনরা। ছোট মেয়েটির মতামত কেউ চায়নি। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি যে তার ওইভাবে যেতে ভালো লাগে কিনা। হঠাৎ পুতুল খেলার মাঝখান থেকে তাকে উঠে আসতে হত। তারপর এ বাড়িতে এলেই বড় বড় পাকা গিন্নীরা, প্রৌঢ়া দাসীরা তাকে দেখত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নেড়েচেড়ে দেখত তার সেই সব ভারী ভারী গয়নাগুলোকে। সুহাসিনীদের পরিবারটিও ছিল সমান ওজনের বনেদী বংশ। ওঁদের কাছের ও দূরের অনেক জ্ঞাতি গোষ্ঠী তখন ছড়িয়ে ছিল বনেদী কলকাতার চতুর্দিকে। সেই গোষ্ঠীর এক পরিবার ছিল জোড়াসাকোঁর বাসিন্দা। ঐ পরিবারটির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির খ্যাতি তখন সমস্ত কলকাতা কেন সারা ভারতবর্ষেই বিস্ময় ছিল। ওঁদেরই একজন ইতিমধ্যে জগত-জিনে নিয়ে এসেছেন সম্মান। ওই বাড়ির মেয়েরা তখন শিখত লেখাপড়া, একটি বউ তো সেই কোন যুগে স্বামীর সঙ্গে আরবী ঘোড়ায় চেপে ময়দান ঘুরেও এসেছে। কিন্তু সুহাসিনীদের বাড়িতে তখনও বারো বছরে পড়তে না পড়তেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ছেলে-মেয়েদের জন্মের আগেই হয়ে যেত বাগ্‌দান। সুহাসিনীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওঁর ঠাকুরদা কথা দিয়েছিলেন তাঁর যদি প্রথম পৌত্রী হয়, তবে সে এই বাড়ির একমাত্র ছেলেটির বৌ হবে। সুহাসিনীর জন্মের সময়ে সেই ছেলেটির বয়স দশ; তাকেও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু তার কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যেই যুগ বদলের হাওয়া লেগেছিল এ বাড়িতে। তারপর তো সুহাসিনীর নিজের মেয়েরাই অন্দর মহলের বাধা নিষেধের গন্ডি পেরিয়ে চলে এল বাইরের আলোয় ভরা আঙিনায়। ওদের মা হয়ে তিনিও অনেক কালের সেই বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর পেছন ফিরে তাকাননি। অবশ্য এর পেছনে তাঁর স্বর্গত স্বামীর সস্নেহ উৎসাহ আর ভালবাসা না থাকলে যে কী হত তা বলা শক্ত। কিন্তু সুহাসিনীও নিজের জোরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, থামেননি কোথাও। তাঁর চিরটাকাল মনে হয়েছে সামনে তাকিয়ে পথ চলাটাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। সেই যে উপনিষদে কোন ঋষি বলে গেছেন, 'চরৈবেতি', এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। ঐটিই তাঁর মূল মন্ত্র, ছেলে-মেয়েদেরও বলেছেন সেই কথাটাই বারবার। আজ শহরতলি আর শহরের মেয়েদের মাঝখানে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের কর্মক্ষেত্র। সেই পথ ধরে এসেছে খ্যাতি, এসেছে সম্মান।

সেই অল্প-শিক্ষিতা সাধারণ বৌটিকে তুলে নিয়ে গেছে আজ অসাধারণ পর্যায়ে। এখন বেতার, দূরদর্শনের আহ্বানও আসে তাঁর কাছে সাক্ষাৎকারের জন্য- অবাকই লাগে ভাবলে। জীবনের প্রান্তবেলায় বসে বসে সেই কথাগুলোই আজ আসা যাওয়া করছিল তাঁর মনের মধ্যে।

আজকে সুহাসিনীর এক মেয়ে আসছে ক্যানাডা থেকে কয়েক সপ্তাহের জন্য। কতদিন দেখেননি মেয়েকে। সকাল থেকে তাই অপেক্ষায় বসে আছেন এই বারান্দায়। ওঁর ছেলে-মেয়েরাই এখন জীবনের সবচেয়ে দামি জিনিস। ওই ভারী ভারী গয়নাগুলোর চেয়েও অনেক বেশি দামি। ওদের আর ওদের ছেলে-মেয়েদের ভেতর দিয়েই জগতটাকে চিনে নেন তিনি; দেখতে পান যুগ বদলের হাওয়াটা লেগেছে এসে কোন পালে!

ট্যাক্সিটা এসে থামল। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সুহাসিনী- ওঁর বড় ছেলে আর পর্ণা নামল। মেয়ের শান্ত বিষণ্ন মুখখানা দেখে তাঁর বুকের মাঝখানটা একবার মুচড়ে উঠল। পর্ণার সদানন্দ, সদা হাস্যময় স্বামী অকালে পাড়ি জমিয়েছেন ওপারে। তারপর এই প্রথম মেয়ে আসছে মায়ের কাছে। তিনি তো জানেন পর্ণাকে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে হবেই, আর মা হয়ে তিনি সেই কথাটা ওকে যদি বোঝাতে পারেন, তবেই তাঁর মা হওয়া সার্থক। সুহাসিনী আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় পায়ে নেমে এলেন নিচে। পর্ণা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সুহাসিনী ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পর্ণা বলল, 'মাগো, আমি যে কাঁদতে পারছি না। কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু পারছি না।' মা বললেন শান্ত গলায়, 'কান্নারও কিছু প্রয়োজন আছে জীবনে, আর সেই প্রয়োজনও সামান্য নয়। কিন্তু চোখের জল বড় নিজস্ব ধন, বড় দামি। যেখানে সেখানে ফেলো না। যে বুঝবে তোমার কষ্ট, যে তোমার মনটাকে ছুঁতে পারবে, তেমন লোকের সামনেই ফেলো। নইলে অমন মূল্যবান অনুভূতির সম্পূর্ণ অপব্যয় হবে।' মেয়ের হাতখানা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবার বললেন তিনি, 'আনন্দটাও কিন্তু জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ। সেটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কান্না দিয়ে জীবনটাকে ভরে রেখো না। আনন্দের মধ্যেই খুঁজে পাবে জীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার তাৎপর্য।' এতদিনে পর্ণার বুকের পাথরটাতে যেন লাগল পরশমণির ছোঁয়া, আর সেই পাথর গলে সোনার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওর এতদিনের কান্নাটিকে। মা-মেয়ে উঠে এলেন উপরে।

কেটে গেল কয়েকটা দিন নানা ব্যস্ততায়। রোজ রাত্রে মা-মেয়েতে নানা পুরনো কথা হয় শুয়ে শুয়ে। পর্ণা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা মা, আসতে তো এ বাড়িতে সেই কোন ছোটবেলা থেকে, বাবাকে দেখোনি কখনও?'

- কেন দেখব না। ওই তো, বাড়ির চত্বরে সে পায়ে চাকা লাগানো কী একটা পরে দৌড়ে বেড়াত। পরে জেনেছি সেটা ছিল রোলার স্কেটস্ আমিও একদিন পরতে চেয়েছিলুম, মোটেই পাত্তা দেয়নি।

পর্ণা হেসে ফেলে।

-মাগো, কী করে তুমি ভেবেছিলে যে সেই যুগে বাড়ির হবু বৌকে রোলার স্কেটস্ পরে দৌড়তে দেবে কেউ!
- মুশকিলটা ছিল তো সেখানেই রে। ওই যুগের সেই অন্যায় অনুশাসনটা মানতে যে ইচ্ছে করত না আমার। জানিস...
উত্তেজনায় উঠে বসলেন তিনি।
- দাসীদের সুপুরি কাটার দঙ্গলের মধ্যে বসে একদিন শুনতে পেলুম, এক রকমের গাড়ি চলছে কলকাতার রাস্তায়। সাপের মত আঁকাবাঁকা লাইন পাতা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে চলে ঝকঝকে দুটো গাড়ি, একসঙ্গে জোড়া। ওগুলোকে বলে নাকি ট্রামগাড়ি। ব্যাস, আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললুম ওই গাড়িতে একবার চাপতে হবেই হবে।
- চাপতে গেলে তো ভাড়া লাগত। সেটা কী করে জোগাড় করবে ভেবেছিলে?
- দাসীদের কাছ থেকেই জেনে নিলুম ভাড়া কত। পান সাজার জন্য কিছু দিতেন ঠাকুরমা। সেইটুকু জমিয়ে জমিয়ে একদিন রওনা দিলুম সেই ট্রামগাড়ির অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে। দুপুরবেলায় তখন দাসীদের দল মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। মা-ঠাকুরমারাও যে যার ঘরে চুল এলো করে শুয়ে পড়েছেন। চারিদিকে নিঝঝুম, বাইরে দারোয়ানজী ওই সময়ে খৈনী টিপতে টিপতে ঝিমিয়ে নেয়- সেটাও জানা ছিল। পা টিপে টিপে দুটো মহল তো পেরোলুম। প্রায় পৌঁছে গেছি সিং দরজার কাছটিতে- আর দু'পা; তারপরই সেই ট্রামগাড়ির রোমাঞ্চময় জগৎ। যেই না পা বাড়িয়েছি হঠাৎ টান পড়ল বিনুনিতে- মায়ের খাস দাসী, সুন্দরীর বাউটি পরা হাতের টান। একটানে আমার সামনে থেকে সরে গেল সেই খোলা আকাশের জগতটা। মুছে গেল সেই ট্রামগাড়ি আর সেটাকে ঘিরে শত রকমের রোমাঞ্চ। ঘুচে গেল আমার ট্রামগাড়িতে চাপার সাধ।
- কিন্তু মা, তুমি তো তারপর কতবার চড়েছ ট্রামে- এমনকি এখনকার এই আধুনিক পাতাল রেলেও। তারপরও সেই দুঃখটা ভুলতে পারনি?
- না রে, ভোলা কি যায়? নিজে নিজে সেই নিষেধের গন্ডিটাকে পেরোবার সাহস, সেই নীরব বিদ্রোহ- তার কি কোন তুলনা আছে?
পর্ণা দুহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'মাগো, এখন বুঝি, তুমি কেন আমাদের সকলকে এমন করে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়েছিলে।'
চলে গেল আরো কয়েকটা দিন। একদিন পর্ণা বলল, 'মা, কত জঞ্জাল জমে রয়েছে এই দেওয়াল-আলমারিগুলোতে। একটু পরিষ্কার করে কিছু জিনিসপত্র ফেলে দিই, যদি বলো।'
সুহাসিনীরও আপত্তি নেই তাতে। এ বাড়ির বহু প্রাচীন জিনিসও রয়েছে ওইসব আলমারির মধ্যে। ছেলেমেয়েদের অনেক দিয়েও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাদের ছোট সংসার, ছোট বাড়ি। তারা সব নিতেও চায় না। অথচ নিজের হাতে ফেলতেও পারেননি; পর্ণা যদি পারে, করুক না।

পর্ণা বসে গেল সাবান গোলা জল আর ক্যানাডা থেকে আনা স্পঞ্জ নিয়ে। সারাটা দিন ধরে অনেকটা পরিচ্ছন্নও করে আনল সে। তারপর বসল মায়ের পুতুলের আলমারিটা গোছাতে। সুহাসিনীর সাতটি ছেলেমেয়ে বরাবর দেখে এসেছে তাদের মায়ের বড় পুতুলের সখ। তাই তারা, বিশেষ করে তাঁর বিদেশবাসী ছেলে-মেয়েরা, যেখানে যখন নতুন ধাঁচের পুতুল দেখে, এনে দেয় মাকে। নতুন কোন পুতুল দেখলেই মায়ের মুখখানা এখনও কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেটা ভেবেই হাসি পেল পর্ণার। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আলমারির একটা তাকের পেছনের দিকে; কয়েকটা পুরনো চীনেমাটির, সেলুলয়েডের আর পোড়ামাটির পুতুল রয়েছে। সেগুলোকে বের করে দেখল- কোনটাই আস্ত নয়। একটার নাক থেবড়ে গেছে, অন্যটার হাত নেই, আবার আরেকটার পায়ের দিকটাতে চিড় ধরেছে। পোড়ামাটির পুতুলগুলোর তো রঙ উঠে নাক মুখ সব মুছেই গেছে একেবারে- সবকটাই অত্যন্ত পুরনো আর শ্রীহীন। এগুলো ফেলে দিলে মা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। তবু ফেলে দেবার আগে মাকে একবার দেখানো উচিত। পর্ণা ডেকে আনল সুহাসিনীকে। 'মা, দেখ তো এই হতকুচ্ছিত পুতুলগুলোকে। তোমার তো এত পুতুল, এগুলোকে রাখবার কোন দরকার আছে কি?' হঠাৎ সুহাসিনী যেন আকুল হয়ে উঠলেন, দুহাত বাড়িয়ে সেই আধভাঙা, বিকলাঙ্গ পুতুলকে টেনে নিয়ে বলে উঠলেন- 'না, না। এগুলো ফেলিস না। থাক না এগুলো, কতই বা জায়গা নিচ্ছে- এতই যখন রয়েছে।' তাঁর গলায় কেমন একটা ছেলেমানুষী আবদার ফুটে উঠল। পর্ণা অবাকই হল তার স্থির, ধীর, বুদ্ধিমতী মায়ের এই চাঞ্চল্য দেখে। কিন্তু তখন আর কিছু বলল না সে। আবার ঝেড়ে মুছে ঢুকিয়ে দিল পুতুলগুলোকে আলমারির মধ্যে।

সেদিন রাত্রে আবার মা-মেয়ের শোবার সময় এল। মায়ের পাশটিতে ছোটবেলাকার মতো গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে পর্ণা বলল, 'আচ্ছা মা, সত্যি বলো তো, কী হবে ওই ভাঙা পুতুলগুলোকে রেখে! আমরাও খেলিনি ওগুলোকে নিয়ে। আর তোমার আধুনিকা নাতনীরাও তো বড়ই হয়ে গেছে। তাছাড়া ওসব তারা বোধহয় ছুঁয়েও দেখত না।' সুহাসিনী ওকে কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেন- 'ওরে, তোরা কী বুঝবি। আমার তো সেই বিয়ে হয়ে গেল বারো বছর বয়সে। পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতে কখন দেখি সেই খেলাঘরের সংসার থেকে জোর করে সবাই আমাকে নিয়ে গেল সত্যিকারের সংসারে, যেখানে কল্পনা বলে কিছু ছিল না; না ছিল আপন মনে নিজের কোণটাতে লুকোবার অবকাশ। সেখানে সবাই বড় বাস্তব, বড়ই প্রকট। বিয়ের ঠিক পরেই কদিন বাদে যখন প্রথম বাপের বাড়িতে এলুম, মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে, একটা মস্ত দম নিয়ে প্রথমেই ছুটেছিলুম আমার পুতুলের সংসার দেখতে। গিয়ে দেখি সব ফাঁকা। খুড়তুতো, মাসতুতো ছোট বোনগুলো তক্কে তক্কে ছিল কবে দিদিভাই শ্বশুরবাড়ি যাবে, আর সেই পুতুলগুলো ওদের হয়ে যাবে। আমার মা সেটা জানতেনও। তাই তিনি সেগুলো ওদেরই দিয়ে দিয়েছিলেন। এটুকু বোঝেননি যে বারো বছরের ছোট্ট মেয়েটার পুতুল খেলা তখনও শেষ হয়নি। কী কষ্ট যে হয়েছিল সেদিন, কী করে তা বোঝাব তোকে এতদিন পরে! পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছিলুম আমার সেই পুতুল ছেলে-মেয়েদের শোকে। দু'চারটে অবশ্য ফেরৎ পেয়েছিলুম সেবারে, মা হয়ত ব্যথাটা খানিক বুঝেছিলেন। সেইগুলোই ওই পুতুল, ওদের নিয়ে খেলা আর হয়নি আমার। তেরো পুরে চোদ্দতে পা দিতেই কোলে এল তোর বড়দি। একে একে এল তোর দাদা-দিদিরা ও তুই। জ্যান্ত পুতুলরা এসে গেল সত্যিকারের সংসারে। ওই প্রাণহীন জড় পুতুলগুলো রয়েই গেল আলমারির কোণে। কিন্তু কী জানিস? ওই সঙ্গে রয়ে গেল বারো বছরের সেই

কান্ডজ্ঞানহীন মেয়েটার পুতুল খেলার সাধ। ওগুলোকে ফেলে দিলে যে সেই অপূর্ণ সাধটাকেও ফেলে দেওয়া হবে, আর চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে সেই বারো বছরের ছোট্ট অবুঝ মনটা।'

(মুখে শোনা স্মৃতিচারণের ছায়া অবলম্বনে)

নবজীবন

দিলীপ চক্রবর্তী

খাঁচা ছেড়ে পাখি ডানা মেলে নীল দিগন্তে উড়ছে
নেই কোন অন্ত, ফেলে আসা বন্দী জীবনের
নেই কোন বেদনা, আছে শুধু
স্বাধীনতার অব্যক্ত অনিশ্চয় যাতনা।

মনের কামনা নীল গগনে উড়ছে
অন্তহীন পুলকের কামনায়,
সবকিছু থেমে যায় না পাওয়ার বেদনায়,
চোখে পড়ে ভূমিতলে নিরাশার কালো ধোঁয়া।

শীত আসে হতাশার তুষার কার্পেট বিছিয়ে,
সবুজ সরল প্রাণের হয় অপমৃত্যু।
হতাশ নব যুবতীর অপেক্ষায় থাকে-
প্রিয়তমের পদধ্বনি নিয়ে আসে
নতুন জীবনের ইঙ্গিত-
হৃদয়ে হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ।

শীত শেষ বসন্তের উচ্ছাস নিয়ে আসে
পিয়াসী বুকের কোমল কম্পন,
অপেক্ষায় থাকে কবে হবে হৃদয়-মিলন,
সৃষ্টি হবে নব জীবনের অঙ্কুর,
ধরায় হবে সবুজের কার্পেট আর
যুবতীর কোলে জন্ম নেবে
নবযুগের প্রতিনিধি এক সৎ, সরল শিশু,
সকলের প্রিয়, সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এক নতুন মানব।

নিজেকেই একটু পুষি

বলাকা ঘোষাল

সপ্তাহে দু-দুবার টাটকা জীবন্ত উচ্চিংড়ে কিনে আনতে হবে শুনেই, ছেলের ব্যাঙ পোষার সখে জল ঢেলে তক্ষুণি জুতোর বাক্সে রাখা এককুচি ব্যাঙ বাবাজীকে বাগানে ছেড়ে দিলাম। নিজের ডাল ভাত কখন রাঁধিবাড়ি ঠিক নেই। কোনরকমে মুদি-বাজার আর কাঁচা-বাজার সারি, এই যথেষ্ট! তা নয়, আবার উচ্চিংড়ে কিনতে যেতে হবে দুদিন পর পরই? বোঝ ঠেলা! তবু একবার 'পেটস্ মার্টে' ঢুঁ মেরেছিলাম। একটি ছেলে এনে দেখাল টান টান করে ফোলানো একটা ব্যাগে ডজন খানেক উচ্চিংড়ে লাফালাফি করছে। সেটা দেখে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম এর কোনও বিকল্প আছে কিনা। ছেলেটি অম্লান বদনে বলল- হ্যাঁ নিশ্চয়ই। পোকা ধরাবার জাল নিয়ে বাগানে দৌড়দৌড়ি করে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ব্যায়াম কে ব্যায়াম হবে, আবার ব্যাঙ খাওয়ানোও হবে। সবাই খুশি। শুনে আমি খুব একটা খুশি হতে পারলাম না। বাগ্-নেট্ হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে আমরা দৌড়ে বেড়াচ্ছি, আর উচ্চিংড়েরা অনায়াসে আমাদের জাল এড়িয়ে পাশে পাশেই নেচে বেড়াচ্ছে... দৃশ্যটা ভেবেই আমার হাসি পেল। আর দুশ্চিন্তা হ'ল যে বহু দৌড়ের পর যথেষ্ট উচ্চিংড়ে না ধরতে পারার কারণে আমার রোগা হওয়ার থেকে ব্যাঙটাই হয়ত বেশী রোগা হয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই? কাঁচের বাক্সে মাটি, পাথর, নারকোল মালার বাড়ি, ছোট্ট পুকুরে জল, গাছের ডালপালা, ব্যাঙের চামড়া ভেজা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে তার গায়ে জল ছেটানো কত কী হ্যাপা! আর আমাদের ঠান্ডা বাড়িতে ব্যাঙের ছোট্ট বাড়িখানা গরম রাখবার জন্য সারারাত হীট্-ল্যাম্প জ্বেলে রাখার ফলে এ.সি আর হীট্-ল্যাম্পের প্রতিযোগিতায় যেটা হারবে সেটা হ'ল আমার সাধের ইলেকট্রিসিটি বিল্।

ছেলেকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হ'ল বৈকি! জুতোর বাক্সে নানান ডালপালার মাঝখানে রাখা সেই ব্যাঙটির সঙ্গে আমার ছেলে, আকাশ লুকোচুরি খেলে বেশ মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। তাকে বললাম- তুই বড় হয়ে, চাকরি করে যা প্রাণ চায় পুষিস, আমি কিচ্ছু বলব না। আপাতত আমাদের এই বাগানটাই ব্যাঙের বাড়ি ভেবে সান্ত্বনা পাক। বাড়িতে দু-দুটো হুলো তো বিরাজ করছেই, তাদের ভাবখানা যেন আমরাই ওদের পোষা!

এরপর এল সাপ পোষার অনুরোধ। সে বেলায়ও তাই। না, সাপটি আকাশ ধরে আনেনি বাগান থেকে। এবার সাপ পোষার হোম-ওয়ার্ক করতে গিয়েই আটকে গেলাম। তাকে ঘরে আনবার প্রস্তুতি পর্বেই স্টপ্। ব্যবস্থা যেন পুরো একটা সংসার, তবু গ্যারান্টি নেই সে প্রমোদ ভ্রমণে বেরোবে কিনা। আমার স্কুলের বিজ্ঞানের টিচার, মিস্ গেল্‌বার-এর তিনফুট অজগর সাপ যখন এক সকালে গায়েব হয়ে গেল তার কাঁচের বাক্স থেকে, তখন থেকেই আমার টেন্‌শান্ শুরু। গেল্‌বাকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত হতে দেখলাম না। সে স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দিব্যি ক্লাস নিতে থাকল রোজকার মতন। আমি কান খাড়া রাখলাম কারুর চীৎকারের অপেক্ষায়। প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে ফিসফিসিয়ে আমার উদ্বেগের কথাটা বলেই ফেললাম। উনিও স্বভাবে গেল্‌বারই মাসতুতো ভাই। হেসে বললেন- খুঁজে না পাওয়া অবধি কারুর জানবার দরকার নেই। বুঝলাম এই খবর রাষ্ট্র করে কারুকে ঘাঁটাতে চান না তিনি।

দুদিন কেটে গেল। গেল্‌বার মতে তেমন খিদে পেলে সে নিজেই বেরিয়ে আসবে। অবশ্যই অকাট্য যুক্তি। কিন্তু আমি ভাবছি গেল্‌বার সাপ কাকে গিলবে। দিনের পর দিন যখন কেটে গেল তখন ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁচকি একটা প্রাইজের লোভ দেখিয়ে তল্লাশির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্কুলের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটা ল্যাবের ফ্রিজের পেছন থেকে তাকে বের করে আনল। ওই ফ্রিজের ভেতরেই ওর ফেভারিট্ ইঁদুরগুলো রাখা থাকে কিনা, আর তারই উষ্ণতা ঘিরে ঘুম মারছিলেন এই সাপ মহাশয়! সাপ পুষব কি পুষব না ডিলেমার সেখানেই ইতি।

আমাদের পাড়ার একটা একতলা অ্যাপার্টমেন্টের ব্লাইন্ডসগুলো দেখে মনে হ'ত নিশচয়ই কোনও পাগল থাকে ওখানে- সব এলোমেলো ছেঁড়া-ভাঙা। এ বাড়ির বাসিন্দা আলবাৎ সাইকিক্ কেস্। একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে সামনে ঘোরাঘুরি করছি আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছি সেদিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝলাম ব্লাইন্ডসের দশার জন্য কোনও মানুষ দায়ী নয়। বিস্তর হাঁচর-পাঁচরের পরে দুটো মস্ত লোমশ মাথা দেখা দিল জানলায়। দুই পেল্লাই কুকুরের থাবায় আর চোয়ালে সারা বাড়ির সবকিছুই কতকটা ছিবড়ে মতন করে ফেলেছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম যে জার্মান শেপার্ড বা গোল্ডেন্ রিট্রিভার বা নিদেন পক্ষে গঙ্গারামের মতন লেপাপোঁছা ভালো মানুষ সেইন্ট বার্নার্ড কোনটাই চলবে না। রাস্তাতেই বরং ওদের দেখে হাই-হ্যালো, হাত-পা চাটাচাটিতেই সন্তুষ্ট থাকব।

লোকে কী না পোষে- কচ্ছপ থেকে কুমীর, শামুক থেকে র‍্যাট্‌ল্ স্নেক, তালিকার শেষ নেই। হিউস্টন্ আরবোরেটামে যতদিন কাজে ঢুকেছি, গাছ-প্রেমী আর প্রাণী-প্রেমীদের নানারকম স্যাম্পল্ দেখা হয়ে গেছে। আর আছে ডিস্কভারি রুমের প্রাণীদের খাওয়ানো। সেই সুবাদে আমারও একটু উচ্চিংড়ে বা ইঁদুর খাওয়ানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে বৈকি। সেই অফিসে একটাই সাপ, বিষ নেই, বাবুরাম দেখলে খুশি হ'ত। তেড়ে মেরে ডান্ডা করবারও দরকার হ'ত না কেননা সে খুব মিশুকে। হাতে গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে দিব্যি সবার সাথে খেলে বেড়ায়। মাসে একদিন সে খায়- মোটে একটা পুঁচকে সাদা ইঁদুর। বেশ তো খাক না!

কিন্তু আমার সমস্যার এখানেই সবে শুরু। একদিন কফি রুমে ঢুকে দেখি ফ্রিজ্ থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেটে সাদা একটা ইঁদুরের মরদেহ টুপ করে এক কাপ গরম জলে ডুবিয়ে দিল এমা নামের মেয়েটি। আমি তো মনে মনে 'এ মা, এ মা' করে চলেছি। 'ও বাবা গো' বলে লম্ফ দিলে হয়ত কাজে দিত। আর একদিন দেখি আরেকজন ঠিক ওই কান্ডই করছে অন্য আর একটা কাপে। বুঝলাম এখানে এটাই চালু। চায়ের কাপে গরম জল ঢেলে তাতে ইঁদুর 'থ' করা হয়। এদিকে তাই দেখে আমি তো থ হয়ে গেছি! এতদিন আমি যেসব কাপে চা খেয়েছি কোন না কোনদিন সেগুলোতে ইঁদুর গরম করা হয়েছে!

সাপের ইঁদুর খাওয়া, তাও আবার আমার চা খাবার কাপে গরম করা! এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? একদিন আমরা কয়েকজন একটু চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কোন কোন কাপে ইঁদুর গরম হয়েছে কে জানে! শেষে সঙ্কোচের মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে একটা বিশেষ কাপ ইঁদুর গরমের জন্য ডেসিগনেট্ করে দিলে ভালো হয় না কি? শার্পি দিয়ে 'মাউস্ কাপ' লিখে রাখা হোক, প্লীজ! অন্যেরা সায় দিলেও আমার ট্রেনার একেবারেই ব্যাপারটাতে কোনও গুরুত্ব দিল না। তার ভাবনা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললেই তো সাফ্ হয়ে যায়, তাই নিয়ে এত চিন্তা কিসের!

এদিকে কম্পিউটারের পাশে গা ঘেঁষে উল্টো হয়ে শুয়ে একটা ঘুম মারবার প্রেরণা দিচ্ছে আমার হুলো নাম্বার ওয়ান্। আমার শত রকমের কাজ ফেলে ওর থাবায় চিবুকটা রেখে আল্তো করে ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আমিও মাথা এলিয়ে দিলাম টেবিলে। গলায় ভারি মন্দ্রের গুরগুরানির ছোঁয়ায় আমার মন প্রাণ ঘুড়ির মতন উড়তে লাগল। আমাদের দামী সোফার কোণগুলো নাহয় আঁচড়ে ছিঁড়েই দিয়েছে! বাড়ির প্রতিটি জিনিসে ওদের লোমের প্রলেপ- তা-ও সই।

অনেকদিন আগে দু-দুটো ফুটফুটে বেড়ালছানা বাই ওয়ান্ গেট্ ওয়ান্ ডীল্-এ পাওয়া- কোথাও তো তার দাম দিতেই হবে! ওদের সাতাশিটা ন্যাপের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের যে কত কাজ সেই ফিরিস্তির উত্থাপন আর নাই বা করলাম। ভগবানের দয়ায় এদের অন্তত ইঁদুর গরম করে দিতে হয় না!

ভাবলাম সাপ, ব্যাঙ, শামুক, বেড়াল, ইঁদুররা যেখানে খুশি থাক। আমার সারাদিনের অফুরন্ত কাজের মাঝে মনে হয় আমাকেই কেউ পুষুক। একটু যেই জিরোবার ফুরসৎ পাই, মনে হয় গিয়ে একটা বেড়াল মার্কা ন্যাপ্ নিই গে। ছেলের স্কুলের পাট চুকেছে। গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যেবেলা এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানোর পর্বে এখন ইতি। ভাবছি এই ভালো, এখন আমার একটু আরাম করবার পালা। আমি বরং এখন নিজেকেই একটু পুষি!

••••❋••••❋••••❋••••

সভ্যতার সংজ্ঞা

শিরীন নেওয়াজ স্বাতী

সভ্যতার সংজ্ঞাটা যে খুঁজছি আমি
ডিক্শ্নারির পুরনো পাতাতে,
নতুন চাঁদের ঈদের খুশিতে,
কোথাও যে নেই-
সত্যি বলছি হারিয়ে ফেলেছি।

গাজার মাটিতে রক্তগঙ্গা
আবার একাত্তর রফার আকাশে রঙের ঝলক!
ডায়নোসরের ডিমের মতন পড়ছে বোমা-
সভ্যতার সংজ্ঞাটা কেমন আছে,
কেউ কি জানে?

মাথার মধ্যে আটকে যাওয়া গানের মতন
অবুঝ সবুজ শরীরগুলো দুলতে থাকে,
ডুবতে থাকে চোখের পাতায়-
ধোঁয়ার মাঝে ধুঁকছে শুধু শহরগুলো।
সভ্যতার সংজ্ঞাটা কোথায় আছে,
কেউ কি জানে?

ইস্কুলেতে পড়ছে না কেউ-
মানুষ তো নয় গাজার শিশু,
ইঁট-পাথরে জড়াজড়ি করে মরে পড়ে আছে!
সভ্যতার সংজ্ঞা কি লুকিয়ে আছে এদের মাঝে?

হাসপাতালে ঠাঁই নেই তাই
হিম-ঘরের বরফ যেন পালিয়ে গেল
মানুষ নামের লাশের কাছে লজ্জা পেয়ে।
লাশের পরে লাশ যদিও পড়ছে জমা,
মানবতার মৌন দুয়ার বন্ধ তবু
সভ্যতা যে হারিয়ে গেছে এদের মাঝে!

••••❋••••❋••••❋••••

হাফসোল

এস্. এস্. নেওয়াজ

আমাদের পাড়ার বুড়ো দর্জি দোলখোলার মোড়ে
লুঙ্গি সেলাই করত। চশমাটার শুধু একটাই ফ্রেম
সুতোয় বাঁধা, নাকের কাছে তুলো লাগানো,
ফোক্‌লা গাল, সামনে দাঁত নেই। ঘোলা চোখ-
চাইলে মনে হ'ত ডুবে আছে যেন কোন সুদূর
অনন্ত অসীমের মাঝে।

পাশেই মসজিদ- নানারকম কাজ করা মিনার আর গম্বুজ-
আঙুল তুলে আছে বেহেশতের দিকে-
তার দরজাটা ওই দিকেই কিনা!
নামাজিদের নেকীর ভাগ পায় দর্জিসাহেব,
হাতে-সেলাই টুপি বিক্রি করে।
পরনের ছিন্ন গেঞ্জিটাতে গিঁটের শেষ নেই-
লুঙ্গিটা জর্জরিত কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
ভুটে আবেদ আলী কন্ট্রাক্টর যখন শুক্রবারে
জুমার নামাজে আসেন- তাঁর বিশেষ ইচ্ছে হয়
টুপিওয়ালা দর্জিকে দুটো টাকা দিয়ে দেন!
খেটে-খাওয়া মানুষের অপমান হবে ভেবে
আবেদ আলী চার জোড়া ফতুয়া কেনেন বিনা প্রয়োজনে,
কিম্বা দুখানা লুঙ্গি সেলাই করিয়ে নেন।
অন্তরে একটু তৃপ্তি আসে-
আল্লার ঘরে সোয়াব হবে আশা করে।

রহমত স্টোরের সামনে বসে কানাই মুচি
জুতো সারায়- হাফসোল লাগাতে দু'টাকা।
পেরেক মেরে লাগাতার হাফসোল লাগায় কানাই-
দর্জিসাহেবের, কলেজের ছাত্রদের, নারাণ পরামানিকের।
দিনান্তে মাঝে মাঝে দুজনে কাঁচের গ্লাসে বাদামী চা খায়।
শীতের সন্ধ্যায় আসে গ্রামের দুধওয়ালীরা-
পুরু দুধের সরে চিনি মেশানো,
এক প্লেটের দাম আড়াই টাকা।
কানাই মুচি আর বুড়ো দর্জি সেটা ভাগ করে নেয়।
চায়ের চুমুক আর দুধের সরের স্বাদ ভুলিয়ে দেয়
জুতোর তালির হাতুড়ি আর
আধভাঙা মেশিনের দলা পাকানো সুতো।

বাবুখান রোডে খয়রা রঙের খোয়ার রাস্তা দিয়ে
আসে মড়া পোড়াবার মিছিল-
হাঁটুর উপরে ওঠানো ধুতি,
পাগুলো তাদের খোয়ার রাস্তায় চলে চলে শক্ত।
দুটো বাঁশের মধ্যে কাঁথা জড়ানো নির্জীব শরীর-
কপালে চন্দন আর গলায় আধমরা গাঁদাফুলের মালা।
'হরিবোল, হরিবোল' বলতে বলতে ওরা চলে যায়
চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে- রূপসার পাড়ের শ্মশান ঘাটে।
কানাই মুচি আর সামাদ দর্জির চায়ের চুমুকে
বাধা পড়ে এক মুহূর্তের জন্য।
একটু পরে এষার নামাজ আজান হয়।
কানাই তার ফাটা চটি ফটর ফটর করে,
বগলে ছাতা নিয়ে চলে গেল ওই
মড়া পোড়াবার মিছিলের পিছনে।
সামাদ দর্জি উজু করে বসেন-
বাড়ি যাবার আগে নামাজটা শেষ করবার আশায়।

বাবুখান রোডের মোড়ে অন্ধকারটা চেপে বসে
নীরব একটা প্রশ্ন নিয়ে-
ওই রিক্সার ঘন্টাটা কার জন্য বাজছে?

••••❋••••❋••••❋••••

উকিলের গপ্পো

পরাশর শরমা

অনেকদিন মুশকিল আসানের (প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্‌ এজেন্সি) কথা বলা হয়নি। পর পর দুটো জোরদার কেস্‌ সল্‌ভ্‌ করে (উকুনপুরের জোড়া খুন আর নাড়াজোলের রাজবাড়ির কুল-দেবতার দু'শ বছরের পুরনো মুক্তোর মালা উদ্ধার) চীফ্‌ ডিটেক্‌টিভ্‌ কানাই বেরার বেশ নামডাক হয়েছে। কলকাতার কাগজে ছবিও বের হয়েছে। এই সুবাদেই কানাই কলকাতায় একটা ব্র্যাঞ্চ অফিস খুলেছে। কাঁথির পুরনো অফিসটা এখন চালায় অ্যাসিস্ট্যান্ট বলাই পান্ডা।

ভি. আই. পি. রোডের ধারে একটা শপিং সেন্টারের দুতলায় একটা বড় ঘর নিয়ে মুশকিল আসানের নতুন অফিস। ঢুকেই রিসেপ্‌শনিস্টের ডেস্ক। পাশে গেস্টদের বসার সোফা, সামনে একটা কফি টেবিল আর ফ্লোর ল্যাম্প। রিসেপ্‌শন্‌ ডেস্কের পেছনে কানাইয়ের নিজস্ব চেম্বার। বেশ সুন্দর সাজানো অফিস। রিসেপ্‌শনিস্টের কাজ করে মিত্রা বসু, সাইকোলজি অনার্সের ছাত্রী, পার্ট-টাইম্‌ কাজ তার। সকালে দু ঘন্টা আর দরকার পড়লে বিকেলে দু ঘন্টা। মিত্রা ঠিক সকাল আটটায় অফিস খোলে। ডাকে আসা কনফিডেন্সিয়াল চিঠি ছাড়া অন্য চিঠিগুলো খুলে তার ওপর নোট্‌ লিখে কানাইয়ের টেবিলে রেখে আসে। কানাই অফিসে আসে ন'টায়। কিছু কাজের কথা, টুকটাক নোট নেওয়া আর দরকারি চিঠিপত্র টাইপ করে মিত্রা কলেজ চলে যায় দশটায়। তারপর তিনটে নাগাদ ফোন করে জেনে নেয় বিকেলে তার অফিসে আসার দরকার আছে কিনা।

সেদিন সকালে অফিসে ঢুকতেই মিত্রা বলল,
'একটা জরুরি ফোন এসেছিল।'
'কার?'
'ইম্পিরিয়াল্‌ ইন্‌শিওরেন্স কম্পানির লিগ্যাল্‌ ডিপার্টমেন্ট হেড্‌ মিঃ শ্রীবাস্তবের।'
'কী করলাম আমি? মামলা টামলা করবে না তো?'
'কথা শুনে মনে হ'ল না, তবে খুবই জরুরি, ফোন করতে বলেছেন।'
'ঠিক আছে, দেখছি।' এক কাপ কফি নিয়ে কানাই নিজের ঘরে এসে বসল। ডেস্কে মিত্রার রেখে দেওয়া সেদিনের চিঠিগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে কানাই মিঃ শ্রীবাস্তবকে ফোন করল। শুনে মনে হ'ল তিনি যেন কানাইয়ের ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলেন।
'মিঃ বেরা, থ্যাঙ্ক ইউ। একবার আমার অফিসে আসতে পারবেন? খুবই জরুরি, ফোনে বলা যাবে না।'
'এগারোটা নাগাদ আসছি।'
'মেনি থ্যাঙ্কস্‌।'

ট্যাক্সি নিয়ে মিত্রাকে কলেজে নামিয়ে এগারোটার একটু আগেই কানাই ক্যামাক্‌ স্ট্রীটে ইম্পিরিয়াল্‌ ইন্‌শিওরেন্স কম্পানির অফিসে পৌঁছে গেল। দুটো ফ্লোর নিয়ে ওদের অফিস। ন'তলায় এম. ডি. আর ডিপার্টমেন্ট হেড্‌রা বসেন। এলিভেটর থেকে নেমে রিসেপ্‌শনিস্টকে পরিচয় দিতেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস্তবের চেম্বারে নিয়ে গেল। শ্রীবাস্তব সেন্ট জেভিয়ার্স আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন, চমৎকার বাংলা বলেন।
'আসুন মিঃ বেরা, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। বসুন। কফি না কোল্ড ড্রিঙ্কস্‌?'
'কফি হলেই চলবে।'
বেল্‌ বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে দুকাপ কফি আনালেন মিঃ শ্রীবাস্তব। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে কানাই জিজ্ঞাসা করল,
'বলুন মিঃ শ্রীবাস্তব আমায় ডেকেছেন কেন?'
'আমার একটা কেস্‌ আছে, তবে গোয়েন্দাগিরি নয়, আইনগত।'
'আপনাদের এত বড় বড় সব উকিল থাকতে আমাকে?'
'সেটাও আপনাকে বলছি। আমাদের দশজন উকিল আছে। তাদের হাতে বেশ কয়েকটা খুব জরুরি কেস্‌ আছে। প্রায় কোটি টাকার ব্যাপার। আমি এখন ওদের ওখান থেকে সরাতে পারছি না। আমার ওপর এতবড় অফিসের ভার- আইন, বাজেট, স্ট্যাফ্‌ কন্ট্রোল- তার ওপর ডেপুটি এম. ডি-র দায়িত্ব। আর একটা কারণও আছে। আপনি যে নাড়াজোলের রাজবাড়ির কুল-দেবতার মুক্তোর মালা উদ্ধার করেছিলেন, সে কথা আমরা সবাই জানি খবরের কাগজ থেকে। আমাদের এম. ডি-ও জানেন। উনি খুবই ইম্‌প্রেস্‌ড্‌। নাড়াজোল রাজবাড়ির ছোট ছেলে আবার আমাদের এম্‌ ডি-র গল্‌ফ্‌ পার্টনার। তাই এম. ডি আপনাকে দিয়ে এই কেস্‌টা করাতে চান। হাতে একদম সময় নেই, কাল বারোটার মধ্যে জানাতে হবে আপনি কেস্‌টা নেবেন কিনা!'
'বেশ, বলুন কেস্‌টা।'
'মাস খানেক আগে এক প্রাইভেট অ্যাটর্নি এক বাক্স দামী হাভানা চুরুট কেনেন। কেনার পরই উনি আমাদের কম্পানি থেকে এক লাখ টাকার একটা ইন্‌শিওরেন্স কেনেন ইন্‌ক্লুডিং ফায়ার প্রোটেক্‌শন্‌। আমাদের কম্পানির নিয়ম কেনার পর দু মাসের আগে কোন প্রিমিয়াম্‌ দিতে হয় না। এই একমাস ধরে উনি লাইটার দিয়ে চুরুটগুলো জ্বালিয়ে ধূমপান করেছেন। তারপর চুরুটগুলো পুড়ে গেছে বলে উনি আমাদের কাছে এক লাখ টাকা দাবি করেন। আমরা রিফিউস্‌ করি। উনি কোর্টে যান। কোর্ট বলে চুরুটগুলোর ফায়ার ইন্‌শিওরেন্স ছিল, সুতরাং উনি ওগুলো পান করলেও ওগুলো আগুনে পুড়েছে। আমরা হেরে যাই। আমাদের ওই এক লক্ষ টাকা অ্যাটর্নিকে দিতে হবে।'
কানাই বলল, 'তার মানে প্রথম প্রিমিয়াম্‌ দেবার আগেই উনি এক লাখ পেয়ে গেলেন?'
'প্রথম প্রিমিয়াম্‌টার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার ছিল না, কারণ প্রথম প্রিমিয়ামের ডিউ ডেটের আগেই উনি যা করার করে নিয়েছেন। তবে টাকাটা আমরা এখনও দিইনি। কাল বিকেল চারটের মধ্যে ওনার অফিসে চেক দিয়ে আসতে হবে বা চেকটা সার্টিফায়েড্‌ মেলে পাঠাতে হবে। দেখুন মিঃ বেরা, এক লাখ টাকাটা আমাদের কম্পানির কাছে কিছু নয়। এটা একটা প্রেস্টিজ ইস্যু, তাছাড়া কম্পানির রেপুটেশনেরও একটা ব্যাপার আছে তো! তাই আপনাকে

ডাকলাম। আপনি এখন বলুন কেস্‌টা নেবেন কিনা। আপনার ফি'র জন্য কিছু চিন্তা করবেন না। উই উইল্‌ পে ইউ হ্যান্ডসামলি।'
'ইন্‌শিওরেন্স ডকুমেন্টগুলো সব আছে তো?'
'হ্যাঁ মিঃ বেরা, আপনার জন্য সব প্যাকেট করে রেখে দিয়েছি। কাল এগারোটার মধ্যে জানিয়ে দেবেন প্লিজ্‌। আপনি কেস্‌টা না নিলে আমরা কাল এক লাখ টাকা ওনাকে দিয়ে দেব। আমাদের হাতে সময় নেই। অন্য কেস্‌গুলো দেখতে পারছি না, এটা নিয়ে আর সময় নষ্ট করব না।'
'ঠিক আছে দিন, দেখি, আপনারা যখন আমার ওপর ভরসা করছেন। আজ উঠি কাল এগারোটার মধ্যে জানিয়ে দেব।'

কেসের কাগজপত্র নিয়ে কানাই উঠল। রাস্তায় নেমে সামনে হল্‌দিরামের দোকানে ইড্‌লি, দোসা খেয়ে অফিসে ফিরে এল। প্যাকেটটা খুলে কাগজপত্রগুলো দেখতে শুরু করল।
তিনটে নাগাদ মিত্রার ফোন। 'অফিসে আসব? আমার ক্লাস ক্যানসেল্‌।'
'চলে এসো।'
মিত্রা আসতে কানাই তাকে কেস্‌টা বলল।
'কি বুঝছেন? নেবেন কেস্‌টা?'
'এখনও ঠিক করিনি। সব কাগজগুলো পড়ি। তুমি বাড়ি যাও। আমি অফিস বন্ধ করে যাব।'
'না, আর একটু থাকি।'
'ও, ফোন আসবে বোধহয়? ক্লাস ক্যানসেল্‌ হয়ে সব টাইম্‌ ওলোট-পালট!'
'কী যে বলেন!'
'আমি ছেলেটিকে দেখেছি। ডাক্তারি পড়ে না?'
'আপনি কী করে জানলেন?'
'একদিন তোমার সঙ্গে ছেলেটিকে দেখেছিলাম। তার প্যান্টের পকেট থেকে স্টেথোটাও দেখতে পেয়েছিলাম। এই হচ্ছে গোয়েন্দাদের দোষ, সব দিকে নজর। কী আর করা যাবে! যাও ফোনের পাশে বসো। কাল সকাল সকাল এসো।'
মিত্রা বেরিয়ে যাবার পর কানাই আবার কেসের কাগজগুলোর মধ্যে ডুব দিল।

পরের দিন সকাল আটটায় মিত্রা অফিসে এসে অবাক।
'একি, আজ আপনি আমার আগেই চলে এসেছেন?'
'হ্যাঁ, একটু আগেই এসেছি।'
'কেস্‌টার কি হ'ল?'
'কেস্‌টা নিচ্ছি।'
দশটা নাগাদ কানাই ফোন করল শ্রীবাস্তবকে, 'কেস্‌টা নিলাম।'
'থ্যাঙ্কস্‌।'
'আমি আসছি আপনার অফিসে এক ঘন্টার মধ্যে।'
'ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'
এক ঘন্টার মধ্যেই কানাই এল শ্রীবাস্তবের অফিসে।
'মিঃ শ্রীবাস্তব, আপনি ওই অ্যাটর্নিকে এক লাখ টাকার চেক পাঠিয়ে দিন। আর আপনার বেয়ারাকে বলবেন একটা রিসিট্‌ আনতে তিনি চেকটা পেয়েছেন বলে।'
'মিঃ বেরা, এটা তো আমরাই করতে পারতাম। এর জন্য আপনার সময় নষ্ট করার কী দরকার ছিল?'
'মিঃ শ্রীবাস্তব, আমি এখনও শেষ করিনি। যে ব্যাঙ্কের চেক দিচ্ছেন তার ম্যানেজারকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করবেন যেন সেই অ্যাটর্নি চেকটা জমা দিলেই আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে জানায়। আর আপনি আপনার উকিলের মাধ্যমে একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করবেন ওই অ্যাটর্নির নামে। তারপর কেস্‌ শুরু হবে আবার। ইন্‌শিওরেন্সে ফায়ার প্রোটেক্‌শন্‌ ছিল ঠিকই তবে ইন্‌টেন্‌শন্যাল্‌ ফায়ার প্রোটেক্‌শন্‌ ছিল না। উনি নিজেই কোর্টে স্বীকার করছেন যে তিনি চুরুটগুলো জ্বালিয়ে ধূমপান করেছেন। এটা তো case of arson, crime of willfully setting fire on somebody's property or insured property! দু বছরের জেল আর লাখ দুয়েক টাকা ফাইন হবেই হবে ওই অ্যাটর্নির। আমাকে জানাবেন কী হ'ল। আজ আমি উঠি।'

দিন চারেক বাদে কানাই একটা ফোন পেল শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে।
'মিঃ বেরা, অ্যাটর্নি চেকটা ক্যাশ করেছে আর আমরা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করে তাঁকে কোর্টে তুলেছি। মাস খানেক লাগবে কেস্‌টা মিটতে। I'll keep in touch with you, OK!'

মাস দেড়েক পরে কানাই শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে একখানা থ্যাঙ্ক ইউ চিঠি পেল, সঙ্গে একটা পঁচিশ হাজার টাকার চেক।

(Based on true story from Criminal lawyers award contest.)

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল

শিরাজ উল হক

তখন ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ, সাল ইংরাজি ১৯৬০। আমি সবে ক্লাস নাইনে উঠেছি। আব্বা হিলি চেক পোস্টের বড় দারোগা। আমাদের বাসা থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার খুব কাছে। ইচ্ছে মতো বর্ডার পার হই অহরহ, আর সিনেমা হলে উত্তম-সুচিত্রার নতুন নতুন ছবি দেখি- শাপমোচন, সাগরিকা, অগ্নিপরীক্ষা। টিকিটের দাম কুল্লে এগারো আনা। লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিনকাল ভালই চলছিল। এমন সময় দারুণ দুঃসংবাদ- আব্বার বদলির হুকুম এসেছে, আব্বাকে ঘোড়াঘাট থানায় বদলি করা হয়েছে। আমার মা যন্ত্রচালিতের মতো জিনিসপত্র বাঁধা শুরু করলেন। আব্বা শুধু হুকুম দিয়েই খালাস। আমার ও ভাই বোনেদের নতুন জায়গায় যাবার কোন উৎসাহ নেই। আমরা এর মধ্যে জেনে ফেলেছি যে ঘোড়াঘাটে কোন ট্রেন নেই, বাস নেই, সিনেমা হল নেই। কি করে ঘোড়াঘাটে যেতে হয় তাও জানি না।

একদিন সাত সকালে আমাদের বাড়ির সামনে দশ-বারোটা গরুর গাড়ি এসে হাজির। কুলিরা আমাদের মালপত্র টানা হেঁচড়া করে গাড়িতে তুলে দিল। আমি ও আমার ভাই আমাদের গাড়ির পিছনে সবার অজান্তে আমাদের পোষা হাঁস, মুরগী ও কবুতরের বাক্সগুলি তুলে নিলাম। গাড়োয়ানকে বললাম আমাদের গাড়ি সবার পিছনে রাখতে যাতে কেউ আমাদের কর্মকান্ড বুঝতে না পারে।

সকাল দশটা নাগাদ আমাদের গরুর গাড়ির বহর ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রা শুরু করল। অসম্ভব রকম ধুলো উড়িয়ে আমাদের গাড়ির বহর ঘন্টায় দুই মাইল বেগে চলছে। হিলি থেকে ঘোড়াঘাটের দূরত্ব বিশ মাইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দুজন, হাঁস, মুরগী ও কবুতরের দল ধুলো খেয়ে আধমরা। যে গাড়ি পিছনে থাকে তার যাত্রীরাই বেশী ধুলো খায়। বিকেল চারটায় একবার যাত্রায় বিরতি। আমরা ততক্ষণে হিলি-হাকিমপুর থানার সীমানা পার হয়ে ঘোড়াঘাট থানা এলাকায় পা দিয়েছি। একটা বড় হাটের সামনে সব গাড়ি থেমে পড়ল। সেদিন হাটবার। আমরা লাফিয়ে নেমে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন্ বোর্ডের চেয়ারম্যান্ সাহেব আবির্ভূত হলেন, সঙ্গে অনেক রকমের খাবার। নতুন দারোগার সুনজরে পড়ার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন।

ঘন্টা খানেক পরে আবার যাত্রা শুরু। হাট ফেরতা গ্রামের লোকজন অবাক হয়ে দেখছিল লটবহর ও বিভিন্ন বয়সী অনেক যাত্রী নিয়ে গরুর গাড়ির কাফেলা। কয়েকজন অতি উৎসাহী মানুষ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল 'ক্যা বাহে, সার্কাস পার্টি কুঠে যায়?' ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, একটু ঠান্ডাও পড়েছে। আমরা জড়সড় হয়ে গরুর গাড়ির ছইয়ের নিচে বসে আছি। গাড়ি চলছে তো চলছেই। রাত নটা নাগাদ আমরা ঘোড়াঘাট থানার বড় দারোগার বরাদ্দ বাসায় পৌঁছালাম। কেউ কোন কথা না বলে যে যার বিছানা প্যাঁটরা নিয়ে কোনরকমে ঘুমের চেষ্টা চালালাম। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বাড়ির বাইরে এলাম। ফাল্গুনের এক ঝকঝকে সকালে ঘোড়াঘাটের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। চারদিকে লালমাটির ছড়াছড়ি, বাড়ি ঘর সবই লালমাটির, ছনের চাল। নাস্তার পর, থানার এক সেপাই আমাকে আর আমার ছোট ভাই আজিজকে ঘোড়াঘাট দেখাতে নিয়ে বেরোল। থানার সামনে একজোড়া বিশাল বকুল গাছ আর একটা মহুয়া গাছ। অজস্র ঝরে পড়া ফুলে বকুল গাছ দুটোর তলা ছেয়ে আছে। ঘোড়াঘাট বেশ বড়- আধা শহর, আধা গ্রাম। পাশে করতোয়া নদী, আশেপাশে প্রচুর বন জঙ্গল ও আম কাঠালের বাগান। থানার কাছে বাজার ও পোস্ট অফিস, হিন্দু জমিদারদের তৈরী করা পাবলিক্ লাইব্রেরী। এক কথায় আমি ঘোড়াঘাটের প্রেমে পড়ে গেলাম। ঘোড়াঘাট আমার জীবনের 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'।

এর পরে স্কুলে ভর্তি হবার পালা। আমি ক্লাসে লম্বায় সবচেয়ে খাটো ও বয়সে ছোট। গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইনের ছেলেরা প্রায় সবাই সতেরো কিংবা আঠেরো। আমার বয়স চোদ্দ। ক্লাসে পাঁচজন মেয়ে। মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভাল। তিনজন আবার শাড়ি পরে স্কুলে আসে। এরা সবাই শিক্ষকের সাথে ক্লাসে আসে আবার ক্লাসের শেষে শিক্ষকের সাথে কমন্ রুমে চলে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা যাতে ছেলে ও মেয়েরা মেলামেশা করতে না পারে। এর মধ্যেও আমার সাথে সব চেয়ে ছোটখাটো মেয়েটি- বীথিকা দত্তের আলাপ হয়ে গেল। পাঁচ ফুট লম্বা লিকলিকে একটি ছেলেকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই নেয়নি, তাই আমাদের আলাপেও কেউ বাধা দেয়নি। ম্যাট্রিক পাস করবার পর বীথিকা কলকাতায় ওর দাদার কাছে চলে যায় কলেজে পড়ার জন্য।

ক্লাসে আমার পরম বন্ধু শাহাব। শাহাবের বাবা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হিসাবে থাকতেন। শাহাবের নানা এতই অবস্থাপন্ন ছিলেন যে সবাই তাঁকে শেঠজী বলে ডাকত। ওঁর আসল নাম বিত্ত-বৈভবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমি সব সময় ওদের বাড়ি যেতাম এবং আর সবাইয়ের মতো আমিও শাহাবের নানাকে বড় বাবা বলে ডাকতাম। ভদ্রলোক লম্বায় পাঁচ ফুট তিনের মতো, বহরে তথৈবচ, মাথায় প্রশস্ত টাক, ঘাড়ে ও মাথার মাঝে কিছু লম্বা লম্বা চুল। শেঠজী প্রতিদিন এক ঘন্টা সময় নিয়ে তেল, পানি ও চিরুনী দিয়ে চুলগুলিকে মাথার ওপর বসিয়ে দিতেন। এরপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন সম্পত্তি তদারকি করতে। সাইকেল চড়ার মিনিট খানেকের মধ্যেই সব চুল টাক থেকে আলগা হয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকার মত পতপত করে উড়তে থাকত। এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা শেঠজীর কোন কালেই ছিল না।

স্থানীয় গণ্যমান্য লোক হিসাবে শেঠজী প্রায়ই থানায় আসতেন আব্বার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে। দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল, আমি নাইন থেকে টেন-এ উঠলাম। এর মধ্যে হঠাৎ করে আবার আব্বার বদলীর হুকুম হল দিনাজপুর শহরে যাবার। তখন আমার প্রি-টেস্ট দেবার সময়। আমাকে নিয়ে সকলের চিন্তা- দিনাজপুরে নতুন স্কুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব আবার ঘোড়াঘাটে থাকারও কোন উপায় নেই। শেঠজী হয়ত কারো কাছে শুনে থাকবেন এই সমস্যার কথা। উনি একদিন আমাদের বাসায় এসে আব্বাকে বললেন- শাহাবের বন্ধু আমাদের বাড়িতে থাকবে এবং ঘোড়াঘাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। কারুর কোন মতামতের তোয়াক্কা না করে শেঠজী আমাকে নিয়ে গেলেন। আমিও

হোল্ড-অল্ ও জবাফুল আঁকা টিনের স্যুটকেস্ নিয়ে শেঠজীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমাকে দোতলায় দুটো ঘর দেওয়া হ'ল। এ বাড়িতে লেখাপড়ার খুব একটা চল নেই। আমিও এই সুযোগে বইপত্র শিকেয় তুলে মহা আনন্দে শাহাবের সঙ্গে পাখি শিকারের নামে বন বাদাড় চষে বেড়াতে লাগলাম।

শেঠজী অনেক জমি ও গরুর মালিক। সব জমি ও গরু স্থানীয় সাঁওতালদের কাছে বর্গা দেওয়া থাকত। বর্গার সর্ত মতো গরুর প্রথম বাচ্চার মালিক হ'ত বর্গাদার, পরের বাচ্চার মালিক হ'ত গরুর মালিক। শেঠজীর গোয়ালে সব সময় পনের থেকে বিশটা দুধেল গরু থাকত। একজন রাখাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরুগুলিকে চরিয়ে বেড়াত। গরুগুলির জন্য আলাদা কোন খাবারের বন্দোবস্ত ছিল না, তাই খালি মাঠের ঘাস খেয়ে কোন গরুই এক থেকে দেড় পোয়ার বেশী দুধ দিত না। এতেই সারাদিনে চার থেকে পাঁচ সের দুধ পাওয়া যেত। সাঁওতালরা প্রায়ই নতুন বাচ্চা হওয়া গরুকে শেঠজীর গোয়ালে রেখে অন্য আরেকটা গরু নিয়ে যেত, যার ফলে পনের-বিশটা দুধেল গরু সর্বদাই থাকত। একবার সাঁওতালদের সঙ্গে শেঠজীর মনোমালিন্য হয়েছিল, যার ফলে সাঁওতালরা খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। এক সকালে ওরা সবাই শেঠজীর বাড়িতে এসে হাজির। সবার সঙ্গে পাঁচ সাতটা করে গরু। ওরা আর শেঠজীর গরু বর্গা রাখবে না বলে গরু ফেরত দিতে এসেছে। কোন অনুরোধ শুনল না, সবাই শেঠজীর বাড়ির সামনে গরু রেখে চলে গেল। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম চারদিকে শুধু গরু আর গরু। কম করে হলেও হাজার তিন চারেক গরু চারদিকের সব রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। গরুর হাম্বা হাম্বা রবে আর ওদের মল-মূত্রে চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। শেঠজীকে বাধ্য হয়ে সাঁওতালদের সব দাবী মেনে নিতে হ'ল, সন্ধ্যার আগে তারা গরু নিয়ে বিদেয় হ'ল, আমরাও ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামার সুযোগ পেলাম। এরকম একটি সফল শ্রমিক আন্দোলন আমি আগে দেখিনি।

শাহাবের সাথে সাঁওতাল পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জ্যাঠা মুরমু নামে এক সাঁওতালের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। জ্যাঠার বয়স তখন হয়ত ৩৫ হবে। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, পেশীবহুল, তেল চকচকে এই আদিবাসীটি শাহাবদের বাসায় মাঝে মধ্যে দিন মজুরের কাজ করত। জ্যাঠা অসুরের মত পরিশ্রম করতে পারত। ওকে দুপুরে খাবার দেওয়া হ'ত। রাতের জন্য চাল ডাল, তেল ও লবণ এবং মজুরী হিসেবে পাঁচ সিকে দেওয়া হ'ত। আমি প্রায়ই জ্যাঠাকে দুপুরের খাবার দিতাম। এই প্রথম আমি দেখলাম একটা লোককে তিন পোয়া চালের ভাত খেতে।

জ্যাঠার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটির বয়স তেরো, লেখাপড়ার বালাই নেই, ছেলের বয়স দশ- স্কুলে ক্লাস থ্রী-র ছাত্র। আমি জ্যাঠাকে প্রচুর উৎসাহ দিতাম ছেলের পড়া চালিয়ে যাবার জন্য, যাতে ও বড় হয়ে দিনমজুর না হয়ে চাকরি করতে পারে। আমার উৎসাহ যেদিন অতি উৎসাহে পরিণত হ'ল, সেদিন জ্যাঠা আমার ওপর প্রচন্ড রেগে গেল, বলল- তুই কি মনে করিস খালি তোর জাতিই নেকাপড়া জানে, হামার জাতি জানে না? হামার জাতিও নেম্বার আছে। আমি কিছুই বুঝলাম না, শাহাব অনুবাদ করে বলল যে একজন সাঁওতাল সম্প্রতি ইউনিয়ন্ বোর্ডের 'মেম্বার' হয়েছে।

জ্যাঠার কাছে সাঁওতালী ভাষার তালিম শুরু হ'ল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জ্যাঠা আমাকে সাঁওতালী শেখায়। কয়েক মাসের মধ্যে কোন রকমে আলাপ চালানোর মত সাঁওতালী শিখে ফেললাম। এর পরে শুরু হ'ল জ্যাঠার সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে যাওয়া। সাঁওতালরা দু রকমের তীর ব্যবহার করে। যেটার মাথায় লোহার ফলক বসানো তাকে বলে তীর, আর যেটার মাথায় মোষের শিং-এর অগ্রভাগ ভোঁতা করে লাগানো তাকে বলে ধুক্কা। গাছের ডালে বসা পাখি অথবা গেছো ইঁদুর মারার জন্য ধুক্কার খুব কদর, কারণ ধুক্কা কখনো ডালে বিঁধে নাগালের বাইরে যায় না। শিকারে যাবার সময় ওরা সব সময় একটা কুকুর সাথে নেয়, সম্প্রতি কুকুরের সাথে জুটেছি আমি। কুকুরের কাজ হ'ল ঝোপঝাড় থেকে খরগোশ তাড়িয়ে বের করা আর নিক্ষিপ্ত তীর খুঁজে বার করা। কুকুরের দৌলতে সাঁওতালরা কখনো তীর হারায় না। জ্যাঠার কুকুরের নাম সীতা। চকচকে কালো এই নাদুস নুদুস কুকুরটি জ্যাঠার চেয়েও সুঠাম। জ্যাঠা সাধারণতঃ শিকারে গিয়ে গেছো ইঁদুর মারত। তীর ধনুকে ওদের জুড়ি নেই। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই রাতের খাবার জোগাড় হয়ে যেত।

এক সকালে আমি আর জ্যাঠা শিকারে বেরোলাম। বন বাদাড় ঘুরে কয়েকটা খরগোশ ও ইঁদুর পাওয়া গেল। আমরা ইতিমধ্যে জ্যাঠার বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। জ্যাঠা অনুরোধ করল ওর বাড়িতে যেতে। জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর ছিমছাম উঠান, উঠানের শেষ প্রান্তে দুটো ছনের ঘর। লাল মাটির দেয়াল, দেয়ালে হরেক রঙের মাটির ছোপ দিয়ে নানা রকমের ছবি আঁকা। বেশীর ভাগই জন্তু-জানোয়ার, ফুল নয়ত জ্যামিতিক সব নক্সা। জ্যাঠার বৌ আমাকে তালপাতার একটা মাদুরে বসতে দিল। বেতের ডালায় মুড়ি, বীচে কলা আর এক গ্লাস পানি নিয়ে এল জ্যাঠার মেয়ে। পরিষ্কার বাংলায় বলল- খা। মেয়েটি অসম্ভব সুন্দরী, সুঠাম একহারা গড়ন। ওর নাম সুখিয়া। সুখিয়া আমার হাতে মুড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিছু বলতে হবে, কিন্তু কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল- ইং ওকা তেম চলা কানা। অর্থাৎ তুমি কোথায় যাচ্ছ। এ রকম অদ্ভুত প্রশ্নে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখে ও ঘর ছেড়ে চলে গেল। বিকেলে জ্যাঠা আমাকে বাসায় পৌঁছে দিল। আজ এত বছর পরে ভাবতে ভালই লাগে যে আমিও একজন প্রথম শ্রেণীর ইঁদুর শিকারী হতে পারতাম যদি জ্যাঠার থেকে সামান্য উৎসাহ পেতাম।

এর মধ্যে আমার টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নিয়মিত স্কুলে যেতে হয় না কিন্তু সপ্তাহে তিন চার দিন অঙ্ক আর ইংরেজীর কোচিং ক্লাসে যেতে হয়। আমরা সবাই সিওর সাকসেস্ ও টেস্ট পেপার কিনে প্রাণপণ কসরৎ চালিয়ে যেতে লাগলাম। তিন মাস পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, সেন্টার পড়েছে গাইবান্ধা শহরে। ঘোড়াঘাট থেকে বিশ মাইল কাঁচা রাস্তায় যেতে হবে সেই গরুর গাড়িতে। গাইবান্ধা যাবার সপ্তাহ খানেক আগে জ্যাঠা এসে হাজির। ওর মেয়ের বিয়ে, তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছে। গত বৈশাখ মাসে ওর মেয়ে পাড়ার সবার সাথে মেলায় গিয়েছিল। সবাই যখন মেলার

আনন্দে ব্যস্ত, তখন পাশের পাড়ার এক বখাটে সাঁওতাল ছেলে জ্যাঠার মেয়েকে ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। সাঁওতালদের সমাজে যদি কোন ছেলে কোন অবিবাহিত মেয়েকে ফুলের মালা পরিয়ে দেয় তবে ওদের দুজনের বিয়ে দিতে হয়, আর অন্য কারুর সাথে ঐ মেয়ের বিয়ে হয় না। তাই জ্যাঠার মেয়েকেও ঐ বখাটে ছেলেটির সাথেই বিয়ে দিতে হচ্ছে। শাহাবের নানার অনুমতি নিয়ে আমি ও শাহাব ঐ বিয়েতে গেলাম। শেঠজী কোন এক অজুহাত দেখিয়ে বাড়িতে রয়ে গেলেন।

আমরা বিকেল পাঁচটা নাগাদ জ্যাঠার বাড়িতে পৌছালাম। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে রং বেরং-এর কাপড় পরে একটা মন্দিরের মত ঘরের উঠানে তুমুল হৈচৈ করছে। মেয়েদের গলায় ফুলের মালা, খোঁপায় ফুল। সন্ধে সাতটার পর বর ও কনেকে মন্দিরের সামনে আনা হ'ল। তাঁতের লাল নীল ডোরাকাটা শাড়ি ও লাল ব্লাউজে মেয়েটিকে কষ্টি পাথরের প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। কালো চুলে পরেছে নানা রকম বুনো লাল ফুল। রবি ঠাকুরের সাথে তখনো আমার পরিচয় হয়নি - তখনো আমার ক্যামেলিয়া পড়া হয়নি!

বিয়ের অনুষ্ঠান বলে তেমন কিছু হ'ল না। এক বুড়ো, হয়ত পুরুত হবে, কিছু হিজিবিজি মন্ত্র পড়ে বর ও কনের ওপর ফুল ছিটিয়ে দিলেন। এরপর বর ও কনে মালা বদল করল। বিয়ে হয়ে গেল। কিশোরী মেয়েটি সবার দিকে তাকিয়ে এক আশ্চর্য হাসি হেসে বরের হাত ধরে চলে গেল। সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল, মহুয়া মদের স্রোত বয়ে গেল।

এবার ভোজনের পালা। সেগুন পাতার ঠোঙ্গায় মুড়ি, মোয়া, কলা, আলু পোড়া আর মাটির গেলাসে মহুয়া মদ। সবাই মহা উল্লাসে গিলছে। আমার আর শাহাবের ভাগ্যে মহুয়ার রস জুটল না। কিন্তু সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের গলায় মহুয়া ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। মহুয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ আমাদের মগজের সপ্তম তলায় পৌঁছে গেল। সবাই যখন মহুয়ার ঘোরে প্রায় অচেতন তখন শাহাব আর আমি বাড়ির পথ ধরলাম। মহুয়ার গন্ধে আমরা দুজনেই বিভোর। মাঝ রাতে বাড়ি ফিরলাম। ঢুলুঢুলু চোখে কোন রকমে বিছানা আলিঙ্গন করার অপেক্ষা। তার ক'দিন বাদেই গাইবান্ধা চলে গেলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে। ক্যামেলিয়া, বীথিকা আর ধুক্কার ইঁদুর, মহুয়ার মাতাল করা গন্ধ জমে থাকল আমার স্মৃতির কোঠায় 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' হয়ে।

••••❊••••❊••••❊••••

বিবিক্ত দর্পণ

গীতাঞ্জলি বঙ্গ

আজ সকাল আশ্চর্য সুন্দর বাতাসে
রৌদ্রোজ্জ্বল প্রবহমান সময়ের
হাতে ধরা একমুঠো ফুল নিয়ে এল
স্মৃতির গন্ধ ভরে।
এমনি ভোরেই ঋষিরা বলেছেন-
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'
ইচ্ছে হয় আমরাও বলি-
রেখে যাই সময়ের 'চেস্ট'-এ
সারারাত সাধনার শেষে
আলোয় উদ্ভাসিত এককুচি মণি।
কিন্তু সাধনার সে স্থৈর্য্য নেই,
নেই দোলাচল চিত্তে একাগ্রতার আভাস।
বাক্ ব্রহ্মে আর উচ্চারিত হয় না
'আমি জেনেছি তাঁহারে-'
বিবিক্ত দর্পণে কেবলই বাঁকাচোরা ছবি
কৃষ্ণাঙ্গ অর্ধমৃতের জীবন্ত মিছিল।

••••❊••••❊••••❊••••

প্রেমের সেকাল ও একাল
মৃণাল চৌধুরী

আমার সেকাল ও একালের মধ্যে ব্যবধান হ'ল পঞ্চাশ বছর। তাই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রেমের একটা সংজ্ঞা, প্রেমের ভাবধারার একটি চিত্র দেওয়ার ইচ্ছে। প্রথমেই 'প্রেম জিনিসটা কী' প্রশ্নটা মাথায় জাগা মাত্রই বড় সংশয়ে পড়ে গেলাম। একটা সংজ্ঞা, একটা ডেফিনেশন্ ছাড়া জিনিসটাকে বুঝব বা বোঝাবো কেমন করে? যেমন মানুষ- মানুষকে কী কোন সংজ্ঞায় ফেলা যায়? আজও বুঝতে পারলাম না, মানুষ বলতে কী বোঝায়? কেবল হাত পা চোখ মুখ না আরও অন্য কিছু? আসলে শ'খানেক ডেফিনেশনের সমুদ্রে একটা একটা মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। বোঝা দায়।

যাক, প্রেমের একটা রূপ দেওয়া যাক। এই প্রেম খাওয়া-দাওয়ার প্রতি প্রেম নয়, সুন্দরের প্রতি প্রেম নয় বা প্রকৃতির প্রতি প্রেম নয়, বিষয়টি হচ্ছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। এই হচ্ছে উপাদান। এই উপাদান আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, পাল্টেছে শুধু রকমফের। ভবিষ্যতে কি হবে বলা শক্ত। পঞ্চাশ বছর আগে ছিল দূর থেকে দেখা সাক্ষাৎ, তাকাতাকি, মুচকি হাসি, বলি বলি করেও বলা হয়নি, সুযোগ হয়নি, সাহসে কুলোয়নি। শুধু ভেবে ভেবেই মনে মনে তোমাকে ভালবেসে গেছি। বেপরোয়া কল্পনা। প্রেমের খুঁটি হ'ল ভাবনা। শুধু ভেবে যাও। কল্পনার গাছতলায়, কল্পনার চাঁদের আলোয়, কল্প-যমুনার তটে দু'জনে পাশাপাশি, দুটো দেহ নয়, দুটো ইচ্ছে। ইচ্ছের পর ইচ্ছে। তুমি আমার আমি তোমার। দুনিয়া ভেসে চলে যাক, আমরা দু'জনে শুধু দু'জনকে দেবো, চাইব না কিছুই।
আমাদের কালে প্রেমের হাতিয়ার ছিল চোখ আর চিঠি। লজ্জা আর সঙ্কোচ নিয়ে এমনভাবে তাকাবো যে তুমি সব বুঝে যাবে। আর আমি তোমাকে নিয়ে কল্পনার সমুদ্রে ভেসে গিয়ে তোমার সাথে টুকি টুকি খেলব আকাশে বাতাসে। আমাদের কালে সুযোগ ছিল না, কিন্তু প্রেম ছিল। একটু দেখা-সাক্ষাৎ, তাকাতাকি, মুচকি হাসি। সুযোগ বুঝে নিভৃতে ফিস্‌ফাস, প্রথম ধাপে হাতে হাত, পরের ধাপে কাঁধে হাত। তারপর ঠোঁট। প্রেমে হাত আর ঠোঁটের নির্বিচার ব্যবহার। এ তো হ'ল বাইরের খেলা, ভেতরে? ভেতরে হৃদয় লাফাবে তিরতির করে। এই হচ্ছে আমাদের কালের প্রেম, ভালবাসা।

আজকাল প্রেমের রকম পাল্টে গেছে। প্রেমের সুযোগ যত্রতত্র, রাস্তায়-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে, ক্লাবে ক্যান্টিনে, আজকের যুগে ইন্টারনেট্ আর ফেসবুকে। নো চিঠি, চিঠি লেখার সময় নেই, ভাষাও নেই। ই-মেল্ আর টেক্সট্। নো তুমি আমার, আমি তোমার। এখন বেশিরভাগ তুইতোকারির খেলা। কেন জানি মনে হয়, আজকাল আর রোমিও জুলিয়েট্ বা দেবদাস পার্বতী মার্কা প্রেমের এপিসোড্গুলো উবে গেছে। এখন সবাই চালু পার্টি। কেউ আর আগের মতন বোকা নেই। এখন সবাই কেরিয়ারিস্ট, কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। শুধু প্রেম করলেই চলবে? প্রেম তো করলেই হ'ল না? ছেলেরা ভাবে প্রেম করলে গার্লফ্রেন্ডকে প্রচুর সময় দিতে হবে নইলে প্রেম ছেতরে-মেতরে যাবে। প্রেমে পড়লে পড়াশোনা, আড্ডা থিয়েটার সবই মাটি। এদিকে মেয়েরা প্রেমকে কেরিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখছে। প্রেম মানেই বিবাহ, বিবাহ মানেই কর্মজগৎ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে জীবন যাপন।

আজকাল বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে চায় মুক্ত জীবন, স্বাধীন উপার্জন, কর্মজীবন। প্রেমে, বিবাহে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়, আবার কিছু আছে বিবাহের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু প্রেমের প্রতি নয়। সবাই চায় নিরাপত্তা। তার মধ্যে যদি ইচ্ছে হয় খানিকটা প্রেম প্রেম খেলার তাতে আপত্তি নেই। 'হ্যাভিং ফান্' টাইপের। অনেকটা ডাংগুলি খেলার মতন। কিছু মেয়ে আবার 'প্রেম' থেকে পালিয়ে গিয়ে 'কেরিয়ারে' বাঁচতে চায়, তা সে 'চাকরি' হোক বা 'বিবাহ'ই হোক। প্রেমটা অনেক মেয়ের কাছে কেরিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল আর ছোটবেলার আমাতে তোমাতে প্রেম খুব কম দেখা যায়। দু'একটা শুরু হলেও ধোপে টেকে না। কিছুটা খেলে হাঁপিয়ে ওঠে, ব্রেক-আপ্, এক্স বয় ফ্রেন্ড/গার্ল ফ্রেন্ড, এমনিভাবে বেশ কিছু এক্স নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে যাচ্ছে, কোন বিকার নেই, বিরহ বলতে কিছু নেই। ওসব সিনেমায় আর সিরিয়ালে চলে। জান দিয়ে দেবো, প্রাণ দিয়ে দেবো এসব উঠে গেছে। ওটা কেমন বোকা বোকা লাগে। দূর শালা, প্রেমে আজকাল আর কেউ পাগল হয় নাকি। ওসব তো গ্রামে গঞ্জে যাত্রা থিয়েটারে চলে। ভেবে দেখুন আজকাল সত্যিই আর দেবদাস নেই। ব্রেক্-আপ্ হলে একদিনের খেলা, সবকটাই খুচরো, এ নিয়ে গল্প নেই। বেশী প্রেম মানেই ক্যালানে কার্তিক। সিরিয়াস্ ছেলেমেয়ে প্রেমে পড়ে অনেক ভেবেচিন্তে, সবটাই ক্যারিয়ার ভিত্তিক, এরা কেউ প্রেম পূজারী নয়। আসলে এত সুযোগ রয়েছে যে! যত মেলা মেশা, যত সুযোগ, তত অপ্রেম।

প্রেম? সেটা কী বস্তু? একটু ডিফাইন্ করতে পারেন? প্রেমে কেউই আজকাল আর বিশ্বাস করে না, এক বোকারা আর ন্যাকারা ছাড়া। ওটা আউটডেটেড্ কনসেপ্ট এখন। এটা এখন আমাদের প্রয়োজনভিত্তিক সোসাইটি। এখানে বিনা প্রয়োজনের কোনো জিনিস চলে না। প্রেমটা এখন একটা সাইড্ ইস্যু। শুধু নিরেট প্রেম-ভিত্তিক কিছু বাজারে চলবে না, তার সঙ্গে অন্য মালমসলাও অবশ্যই চাই!

তাকে বলা হ’ল না

অপর্ণা মুখার্জী দত্ত

ভালবাসার কি কোনো ভাষা আছে?
আমি বলি, আছে এক ভাষা-
তবে আমার কাছে যা,
তোমার কাছে হয়ত তা না।
যখন তুমি চাইলে আমার দিকে,
কবি হ’লে বলতাম ‘মরালগ্রীবা’,
ঠিক যেন এক অহংকারী রাজহংসী...
কপালের লাল টিপটাকে আড়াল করে দিল
অবাধ্য চুলের ঝালর।
চাইলে তুমি-
‘‘বনলতা সেন’’-এর মতো
‘‘পাখির নীড়ের মত চোখ’’ তুলে নয়...
সদ্য কুঁড়ি ফুটে পাপড়ি মেলা
ফুলের মতো যেন।
চাইলে তুমি-
না, তোমার চোখে আমি দেখিনি
‘‘আমার সর্বনাশ’’!
সে চোখ যেন একপশলা বৃষ্টির পর
সোনাঝরা রোদ-
উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত, ভালবাসায় মোড়া
মমতায় জড়ানো।
সে চোখের বর্ণনা দেওয়া যায়,
কিন্তু সে চাউনি ছিল অবর্ণনীয়!
চাইলে তুমি-
বুকের ভেতর পানকৌড়ির ডুব,
গুরুগুরু করা মেঘ নাকি
রিমঝিম বৃষ্টি,
সাগরের ঢেউ নাকি নদীর জোয়ার!
চাইলে তুমি-
অপার রহস্যে ঘেরা সে চাউনি,
মানে খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা মন-
এলোমেলো ভাবনা ভেসে বেড়ায়
মনের অলিগলি।
বললে তুমি-
রিনিঝিনি সুরে,
‘‘আপনি কি কিছু বলবেন?’’
কয়েক মুহূর্ত যেন কয়েক যুগ-
আবার বলল সে-
‘‘আপনি কি কিছু বলবেন?’’
কিছু বলব? কি বলব?
কতদিন, কতদিন কল্পনা করেছি এই ক্ষণ,
আকাশকুসুম মায়াজাল-
ভেঙেছি, গড়েছি,
কত কথা লুকিয়ে ছিল মনের গহনে-
কি সে কথা? কোন সে কথা?
ভাষা তখন অচিনপুরে
বেঁধেছে তার বাসা!
সে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে-
চোখে যেন সহসা মেঘলা আকাশ,
‘‘ভালো থাকবেন।’’

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে-
সারাদিনের ক্লান্তির পর,
কাঁধের ব্যাগটাকে সামলে নিয়ে,
অফিসের ভিড় ঠেলে কোনমতে,
অনেকটা রাস্তা, রোজকার চেনা-
রাইটার্স থেকে শিয়ালদা,
নৈহাটি লোকাল্টা যেন আবার
মিস্ না হয়ে যায়।

....❋....❋....❋....

জিঘাংসা

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছাপরা নরকাটিয়া গঞ্জের ছোট লাইনের গাড়ি সোনপুর প্ল্যাটফর্মে ইন্ করেছে। সাড়ে সাত ঘন্টা লেট, রাত্রি তখন প্রায় একটা। টিমটিম করে গ্যাস্-ল্যাম্প জ্বলছে। সোনপুর স্টেশনে তখনও ইলেকট্রিক বাতি আসেনি। সোনপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা প্ল্যাটফর্ম। 'গিনেস্ বুক্ অফ্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্'-এ নাকি সোনপুরের নাম আছে। জাহাজ ঘাটের স্টীমার ধরার জন্যে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে শিবসুন্দর চ্যাটাজীকে। যদিও মাল বলতে কাঁধ থেকে ঝোলানো একটা থলি, তবুও ঘুমচোখে আড়াই ফার্লং হাঁটবার তার একটুও ইচ্ছে নেই। রাতের জাহাজ ছেড়ে দিলে পৌষের এই হাড়-কাঁপানো ঠান্ডায় সারারাত গঙ্গার ঘাটে বসে কাটাতে হবে। পাটনা যাবার জাহাজ আবার সেই দুপুরে। প্ল্যাটফর্মের ভেতর গঙ্গার কুয়াশা ঢুকে গ্যাসের বাতিগুলোকে আরও নিস্তেজ করে তুলেছে। স্টেশনের পাশের জঙ্গল থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর ঘাটের পাড় থেকে শেয়ালের ঝগড়ার আওয়াজ ছাড়া সব নিঝুম। এঞ্জিনটা এতক্ষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ করে হাঁপাচ্ছিল- অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিথিল গতিতে কেমন একটা করুণ ধাতব শব্দ করতে করতে সে ফিরে যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলে। দানবের রক্তিম চোখের মতন পেছনের লাল আলোদুটো ধীরে ধীরে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম, বড় জোর জনা কুড়ি হবে। 'চায় গরম, চায় গরম' হাঁকতে হাঁকতে আপাদমস্তক লেপে মোড়া একজন লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার হাত থেকে ঝুলছে চুল্লির ওপর বসানো চায়ের কেটলি। লোকটার মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত রুগীর ব্যান্ডেজের মতন মাফ্লার জড়ানো। কোটরের ভেতর থেকে চোখদুটো শুধু জ্বলজ্বল করছে।

'চায় আজ্কা হ্যায়, য়্যা কাল্কা?'- শিবসুন্দর 'কখনকার' চা জিজ্ঞেস না করে 'কবেকার' চা জিজ্ঞেস করেছে।

'তাজা হ্যায় হুজুর। গাড়ি ডিস্টেন্ট সিগ্ন্যাল্ আনে কে বাদ্হি পানি উবালা হ্যায়।'

চা-ওয়ালার গলায় বেশ সর্দি বসেছে, কথাগুলো খনখনে! এত রাত্রে চা খেলে অম্বল হবে ভেবে শিবসুন্দর কথাটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'গঙ্গাজীকে উস্পার আগ্ কঁহা জ্বল রহা হ্যায়?' তিন চারটে আগুন জ্বলছে নদীর ওপারে।

'গুলবি শ্মশান ঘাট হ্যায় হুজুর। কিসি কা জিস্ম জ্বল রহা হোগা। ছুট্কারা পা লিয়া হ্যায় ইস্ গন্ধী জাহান সে।'-

তার কথার সুরে বেশ নৈরাশ্য। শিবসুন্দরের মনে পড়ে যাচ্ছে বহু বছর আগেকার কথা। এইরকমই এক পৌষের ঠান্ডায় 'যুবক সৎকার সমিতি'র হয়ে মড়া দাহ করতে গিয়েছিল সেই গুলবি ঘাটে। চিতা নিভিয়ে গঙ্গার কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করেছিল। এই রাতের মতন সেই রাতটা কিন্তু এত ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল না। আকাশে একফালি অস্তমিত পিঙ্গল চাঁদ ছিল, আর কুয়াশাটাও এত ঘন ছিল না। কোথাও একটা রাতজাগা পাখির ঝটপটানির শব্দে চমক ভাঙল শিবসুন্দরের। হঠাৎ সে এক্কেবারে নিঃসঙ্গ। যে গুটিকয়েক যাত্রী ছিল তারা দূরে কালো কালো ছায়ার মতন হেঁটে চলেছে জাহাজ ঘাটের দিকে। হঠাৎ গা ছমছম করে উঠল শিবসুন্দরের। পৈতে হাতে ধরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে হনহন করে হাঁটছে সে সামনের চলন্ত কালো ছায়াগুলোকে ধরবার আশায়। মনে হ'ল কে যেন পিছনে সঙ্গ নিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দশ গজ পেছনে সেই চাওয়ালা কালো একটা নেকড়ে বাঘের মতো অনুসরণ করছে তাকে। পাশে ঝোলানো ধিক্ ধিক্ আগুনের চুল্লিটা যেন নেকড়ের রক্তাক্ত মুখগহ্বর! দৌড়তে শুরু করেছে শিবসুন্দর, তবুও কিছুতেই ব্যবধান বাড়ছে না। লোকটা যেন রনপা পরে হাঁটছে। এই ঠান্ডাতেও শিবসুন্দর ঘামছে। নিজের হৃদ্পিন্ডের ধক্ ধক্ শব্দ সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে। শেষের কালো ছায়াটাকে প্রায় ধরে ফেলেছে সে। কাছে এসে দেখে একজন শীর্ণ মহিলা। ঘোমটা টানা নাক পর্যন্ত। এক হাতে একটা টিনের বাক্স আর অন্য হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে হাঁসফাস করছে। শুধু একটা ঝুলি কাঁধে নিয়ে এই দুঃস্থ ক্ষীণ মহিলাটিকে পেছনে ফেলে আসতে শিবসুন্দরের বিবেকে লাগল।

'মদত্ চাহিয়ে?' মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় শিবসুন্দর এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নটা করল।

'বহুত্ ভারী হ্যায়। আপ্কো বহুত্ বহুত্ শুকরিয়া-'

বাপ্রে কী খনখনে গলা! সকলেই কি সর্দিতে ভুগছে নাকি? মাটিতে যেন কাঁসি পড়ল।!

বদ্ধ জাহাজের কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেক্-এ এসে বসেছে শিবসুন্দর। পাটনার শীতে গঙ্গায় প্রচুর চরা পড়ে। কার কম্পানির জাহাজ সন্তর্পণে চর বাঁচিয়ে জল কেটে এগোচ্ছে। চরে একবার আটকে গেলে জোয়ার না আসা পর্যন্ত ছাড়া নেই। দুধারের পাড় কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। জাহাজের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া চারপাশ এক্কেবারে নিঝুম। শিবসুন্দর দেখে সেই চাওয়ালা ডেক্-এর এক কোণায় ঘাপটি মেরে উবু হয়ে বসে আছে। চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে উনুনের লালচে আগুনে।

'ইয়ে চায় হামারা তরফ্ সে তোফা-' বলে চাওয়ালা এক ভাঁড় চা শিবসুন্দরের দিকে এগিয়ে দিল।

তার পরমুহূর্তেই এক আকস্মিক ঘটনা! এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর হাতের এক ঝটকায় চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাওয়ালাকে জুতোপেটা করতে করতে কেবিনের পিছনে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ সেই ঘোমটা টানা শীর্ণ মহিলা কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন- 'বাপু কো মত্ মারো মাস্টারজী, হামারা বাপু কো মত্ মারো।'

উনুন-সুদ্ধ চায়ের সব সরঞ্জাম জাহাজের রেলিং-এর ওপর থেকে জলে ফেলে দিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। গরিবের ওপর এমন অত্যাচার দেখে শিবসুন্দরের মাথা গরম হয়ে গেল। বৃদ্ধটি তারই দিকে এগিয়ে আসছেন এবার। শিবসুন্দর ভাবল দুটো কটুকথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু একী! আবছা আলোতেও সে ইংলিশ টিচার আশু বাঁড়ুজ্যেকে চিনতে পারল। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি.লিট্, ম্যাট্রিকের ইংলিশ টিচার। বললেন-

'শিবু, খবরদার অজানা অচেনা লোকের হাতে বিদেশ বিভুঁইয়ে চা খেও না।'

শিবসুন্দরের মনে পড়ছে রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলের দিনগুলো। আশু বাঁড়ুজ্যের সেই গুরুগম্ভীর গলা, যাঁর ভয়ে স্কুলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এমনকি স্কুলের হেড্-মাস্টার নিরাকার পোদ্দারও তাঁকে সমীহ করে চলতেন। শিবসুন্দর তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাবার আগেই আশুবাবু তিনপা পিছিয়ে গেলেন। বললেন পা ছুঁয়ে প্রণাম করাটা নাকি এক প্রাচীন অস্বাস্থ্যকর প্রথা। শিবসুন্দরের কেমন যেন খট্‌কা লাগল। স্কুলে বহুবার তিনি পা ছোঁয়া প্রণাম নিয়েছেন। ভাবল বুড়ো বয়সে বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। শিবসুন্দর অবাক হয়ে গেল যে পাটনায় পৌষের ঠান্ডায় আশুবাবু একটা ফতুয়া আর খাটো ধুতি পরে জাহাজের ডেক্-এ বসে আছেন, আর শিবসুন্দর আপাদমস্তক গরম আলোয়ানে ঢেকেও এই পশ্চিমের হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে।

'স্যার, আপনার ঠান্ডা লেগে যাবে। আমার আলোয়ানটা গায়ে দিন। আমার গায়ে গরম কোট আছে।' আন্তরিক অনুরোধ জানালো শিবসুন্দর।

'না হে না। আমাদের শীতও লাগে না, আর গরমও লাগে না। 'Parts of speech' মনে আছে? জানো শিবু, তুমিই আমার শেষ ইংরেজিতে 'লেটার' পাওয়া ছাত্র। তারপর বারো বছর পড়িয়েছি, একটা ছাত্রও ইংরেজিতে লেটার পেল না। হ্যাঁ, একজন পেতে পারত, গৌর গাঙ্গুলী। কিন্তু ক্লাস টেনে বাসে চাপা পড়ে মারা যায় সে।'

মনে হ'ল আশুবাবুর চোখদুটো জলে চিক্‌চিক্ করছে।

মহেন্দ্রু ঘাটে নেমে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শিবসুন্দর আশুবাবুকে দেখতে পেল না। তখনও শীতের ভোর হতে খানিক দেরী। চাওয়ালাটি পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, 'ফির মিলেঙ্গে হুজুর।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অমলের বাড়িতে আফ্টার ডিনার ককটেল পার্টি। দেশের ককটেল মানেই 'রাম্ অ্যান্ড কোক্'। দিশী হুইস্কি খেলে পরদিন সকালে মাথা ধরে, আর দিশী 'গোলকুন্ডা' ওয়াইন্ খেলে তৎক্ষণাৎ পেটে ব্যথা। কাল রাত্রে জাহাজের ঘটনাটা বন্ধুমহলে পাড়ল শিবসুন্দর। কিচেন্ থেকে অমলের বৌ-এর হুকুম এসেছে যে সে আড্ডায় না আসা অবধি যেন গল্প শুরু না হয়। অনামিকা একই মেডিকেল কলেজের ছাত্রী- অমলের থেকে দুবছরের জুনিয়র। গল্পের শুরুতেই শিবসুন্দরের সঙ্গে আশুবাবুর জাহাজে দেখা হয়েছিল শুনে সকলেই স্তম্ভিত।

'আশুবাবু তো আজ আট বছর হ'ল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, হেড্ মাস্টার নিরাকার পোদ্দারের তাড়নায়! পোদ্দার তাঁকে চার্জশিট্ দিয়েছিলেন ট্রেজারির টাকা তছরূপ করার মিথ্যে অভিযোগে। সেই অপমানে ও দুঃখে তিনি গঙ্গার ঘাটে বুড়ো বটগাছটা থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। তাঁর সঙ্গে তোর জাহাজে দেখা! হেঃ হেঃ, আমেরিকায় গিয়েও তোর মদের টলারেন্সটা খুবই কম দেখছি। কী আবোল তাবোল বকছিস?' সত্যপ্রিয়, ওরফে লাল শিবুকে খুবই অপ্রস্তুতে ফেলে।

'চা-টা খাসনি তো?' অমল খুব চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'তোকে তো বললাম আশুবাবু এক টান মেরে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। খাওয়ার চান্স পেলাম কোথায়?' শিবু জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছে ডাক্তার বন্ধু অমলের দিকে। অনামিকা ভয়ে অমলের কাছ ঘেঁষে বসেছে। অমল আর একটা রিফিল্ নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে শুরু করল- 'দেখ, ভৌতিক ব্যাপারে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আমি ডাক্তার, ভৌতিক ঘটনায় বিশ্বাস করাটা আমার প্রফেশনের প্রতিকূল। তবে কয়েকটা coincidence এখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। গত তিন মাস আমার এমারজেন্সিতে নাইট্ ডিউটি ছিল। ওই তিন মাসে পাঁচজন রুগী Delayed Poison Syndrome (DLS)-এ মারা যায়। অটপ্সি রিপোর্টগুলোও identical- Hyper Steroid Residue. Cause of death: Cardiac Arrest. পুলিশ রিপোর্টও সব একই ধরনের- জাহজের যাত্রী, সোনপুর থেকে মহেন্দ্রু ঘাট। দুজনের সঙ্গে পরিবার ছিল। তাদের জেরা করে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিরা জাহাজে চা খেয়েছিল। আর তিনটে কেস্ ছিল নিঃসঙ্গ যাত্রী। সকলেরই ব্লাড্ রিপোর্টে tannic acid পাওয়া গেছে।' আর একটা সিপ্ ড্রিঙ্ক নিয়ে অমল আবার বলতে শুরু করল- 'তোদের মনে পড়ে কিনা জানি না মাখনিয়া কূয়া আর নিচলকীর মোড়ে একটা চায়ের দোকান সারারাত খোলা থাকত। সেখানে রিক্সাওয়ালাদের আড্ডা ছিল শ্মশান যাত্রী ধরার জন্য। Anatomy মুখস্থ আওড়াতে আওড়াতে আমি অনেকদিন বি. এম. দাস রোড থেকে হেঁটে সেই চায়ের দোকানে রাত্তিরে চা খেতে যেতাম ঘুমের ঘোর কাটাতে। তারপর একদিন শুনলাম যে চায়ের দোকানটা উঠে গেছে। খবর নিয়ে জানলাম চায়ের দোকানের মালিক তার অবিবাহিতা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে খুন করেছে আর নিজে চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। বহু লোকের কথন যে বাপ বেটিকে দেখেছে জাহাজে চা বিক্রি করতে। সেই বাপের মানব সমাজের উপর ভীষণ জিঘাংসা।'

'তাহলে বলছিস শিবু আশুবাবুর প্রিয় ছাত্র ছিল বলে এ যাত্রা বেঁচে গেছে? শিবু, এতদিনে তাহলে তোর ইংরেজিতে লেটার পাওয়াটা কাজে লাগছে! হাঃ হাঃ হাঃ...' কালাচাঁদ মন্ডলের শ্লেষোক্তি।

গল্প করতে করতে রাত্রি প্রায় তিন প্রহর। পর্দা সরিয়ে অমলের নতুন চাকরটি মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল- 'গরম চায়ে পিজিয়েগা হুজুর? ভোর হোনে হি ওয়ালা হ্যায়।'

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে প্রায় সমস্বরে বলে উঠেছে- 'নহি নহি, চায় নহি চাহিয়ে।'

শিবসুন্দরের মনে হ'ল চাকরের গলাটা বড্ড যেন খনখনে। বোধহয় খুব সর্দি হয়েছে। সোফায় গা এলিয়ে দিতে দিতে শিবসুন্দর বলল- 'হামকো দেনা এক কাপ গরম চায়ে।'

অনামিকা চীৎকার করে বলে উঠল- 'না না, ওকে চা করতে হবে না। আমি তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি।'

ঢাকা ল-৮৫৬৪

এস্. এস্. নেওয়াজ

নিয়ামত আলি খাঁ সাহেবের রেস্টুরেন্ট। মাসকাবারি খাওয়া দাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। পুরনো ঢাকার বংশাল এলাকায় এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা পাওয়া কঠিন। গুলিস্তান, জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউ পেরিয়ে রেল লাইনটা পার হবার পরই নওয়াবপুর রোডের শুরু আর সেখান থেকেই পুরনো ঢাকা। রাস্তার দুপাশে চায়ের দোকান, মেরামতি গ্যারাজ, রিক্সা, বাসের ভিড় আর অজস্র মানুষের অবিরাম স্রোত- তার সাথে আছে মাইকে নানান পুরনো হিন্দী গান- 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া', 'জাদুগর সাঁইয়া' বা 'লাল দোপাট্টা মলমল কহোজি'। একটার সুর আরেকটার সুরের মধ্যে জড়িয়ে আছে। এই নওয়াবপুর রোড অনেক অলি-গলি শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্ককে বাঁয়ে ফেলে একদম সদর ঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। তার আগে একটু ডাইনে ঘুরলেই জগন্নাথ কলেজ, আমার কর্মজীবনের প্রথম ঠিকানা। ধারে পিঠে শাঁখারি বাজার আর ইস্‌লামপুর রোড থেকে বংশালে পাওয়া ভাড়ার ঘরটাই থাকবার জন্য ঠিক হ'ল। আর তাই খাঁ সাহেবের রেস্টুরেন্টটাই ভরসা।

জগন্নাথ কলেজের দুই শিফটের ক্লাস; দিনে ও রাতে। প্রিন্সিপ্যাল্ সাইদুর রহমান সাহেব বললেন- ম্যালা টাকা পাইবা। যখন ক্লাস থাকে তখন পালওয়ানের মোরগ পোলাও, হাজীর বিরিয়ানি বা পুরনো ঢাকার বিখ্যাত তেহেরি হ'ল নিয়মিত মেন্যু। ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে, বাসে ঝুলে সময়মত ক্লাসে আসতে দারুণ অসুবিধা হয়। তাই ঠিক করলাম একটা মোটর সাইকেল কিনি। সুবিধা বুঝে আমার কলেজের এক বন্ধু তার পুরনো ব্রিজস্টোন্ সাইকেলটা গছিয়ে দিল। এক গ্যালন পেট্রোলে ঢাকা শহরে স্বাধীনভাবে তিনবার চক্কর দেওয়া যায়, তাতে মহা সুবিধে। সমস্যাটা হ'ল মোটর সাইকেলটার বেগের চেয়ে আবেগটা একটু বেশী। ভট্ ভট্ আওয়াজটা বেশ জোরালো আর মাঝে মাঝেই বেঁকে বসে- চলতে চায় না। তখন তাকে ধাক্কা দিতে হয়। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের নীচে মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রাখি। কিন্তু রওয়ানা হবার আগে দেখে নিই কোন ছাত্র-ছাত্রী আশেপাশে আছে কিনা। বিশেষতঃ ছাত্রীরা- একটু মুচকি হেসে 'আদাব স্যার' জানাবে ঠিক তখনই যখন ওটাকে ঠেলতে হয়! আবার কখনো মেজাজটা বেশী খারাপ হলে সাইকেলটা আমার বাহন না হয়ে আমাকেই তার বাহক হতে হয়। তখন অনেক কষ্টে রিক্সাওয়ালাকে রাজি করিয়ে, সাইকেলটাকে রিক্সায় চাপিয়ে গ্যারাজে নিয়ে যেতে হয়। গ্যারাজের মালিক আমার ওপর দারুণ খুশি। গেলেই আপ্যায়িত হই- 'পরফেসর সাবের লাইগ্যা এক কাপ চা লইয়া আয়।' আমি তাঁর বাঁধা খদ্দের। সাইকেলটা কোলে নিয়ে আর বারবার রিক্সায় চড়তে ভাল লাগছিল না। বিশেষতঃ ছাত্রীদের মুচকি হাসির জন্য! বেশ কড়া গলায় তাই গ্যারাজের মালিককে বললাম- 'কী ব্যাপার বলেন তো! এরকম আর কতবার ঘোরাবেন?' তিনি বলেন- 'সার, আপনারা শিক্ষিত মানুষ, বুজবেন। এই পিস্টন্‌ডা চেঞ্জ করছি তিনবার- ১ নম্বর, ২নম্বর, ৩ নম্বর। এইবার আহেন পুরা সিলিন্ডার, পিস্টন্ যত কিছু আচে এইডার ভেতরে সব চেঞ্জ কইরা দিমুনে। দুই দিন বাদে আহেন।' 'ঠিক আছে।' বলে আমি বিদায় নিই।

দুদিন পরে গ্যারাজে হাজির হলাম। সামনেই সাইকেলটা রাখা- চিনতে পারছিলাম না। বিশেষ খদ্দের হিসাবে আমাকে খাতির করে সাইকেলটার দুটি মাডগার্ডই রঙ করে রেখেছেন। কিছু জংধরা জায়গায় কটকটে নীল রঙ করা। সামনের মাডগার্ডের উপর লাল ফুল আর লতাপাতা আঁকা- ঠিক ঢাকার রিক্সার পিছনে যেরকম থাকে। শুধু লায়লা-মজনুর ছবিটাই বাকি আর কী! আর পিছনের গার্ডের নীচে ক্লাস থ্রীর হাতের লেখার মতো সাদা রঙ দিয়ে থ্যাবড়া অক্ষরে লেখা- 'ঢাকা ল-৮৫৬৪'। গ্যারাজের মালিক মুখের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দাঁত বের করে সোল্লাসে বললেন- 'দ্যাখচেননি সার, কেমন জেল্লা লাগাইয়া দিচি!' একটা বিরাট ঢোক গিলে সাইকেলটা নিয়ে ফিরে এলাম।

দিনে ও রাতে ক্লাস থাকলেও ডিপার্টমেন্ট হেড্ এমনভাবে ক্লাসের রুটিন করতেন যে কাউকেই সপ্তাহে তিনদিনের বেশী কলেজে যেতে হ'ত না। আর তারপর তো ছুটি, হরতাল, স্ট্রাইক্ লেগেই আছে। মোদ্দা কথা হাতে অফুরন্ত সময়। তাই সেগুন বাগিচায় USIS, নীলক্ষেতের ব্রিটিশ কাউন্সিল্ বা রমণার পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীতে নিয়মিত যাতায়াত সম্ভব হ'ত। তার সাথে শহরের সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও ৮৫৬৪-এর কল্যাণে যোগাযোগ সহজ হয়ে গেল। তাঁদের কেউ সেকেন্ড ক্যাপিট্যালের কাছে জুট্ রিসার্চে, কেউ অ্যাটোমিক্ এনার্জিতে, কেউ বা এঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরে কাজ করেন। আর কাজের মধ্যে কাজ হ'ল কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের টাইপ্ রাইটারটির সদ্ব্যবহার করা। ব্যবহারের অভাবে ওটাতে ধুলো জমছিল। সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইউনিভার্সিটিগুলোর ঠিকানা জোগাড় হয় লাইব্রেরীর মাধ্যমে। আর তাদের সাথে চিঠি লেখালেখি হয়ে উঠল আমার প্রধান কাজ।

১৯৬৬ থেকে১৯৬৯ পর্যন্ত ঢাকায় থাকার জীবনে আমার সবচেয়ে আনন্দদায়ক সঙ্গ ছিল খুলনা কলেজ জীবনের বন্ধু নরুল আজম খানের সান্নিধ্য। বাংলাদেশে রোড অ্যান্ড হাইওয়েজের চীফ্ এঞ্জিনিয়র হবার কয়েক দশক আগের জমানা সেটা। তখন শুধুমাত্র জুনিয়র অফিসার হয়ে ঢুকেছে সে। আমরা জার্মান এম্বাসীতে জার্মান ক্লাস নিতে শুরু করলাম, আর আড্ডাগুলোতে ভাঙা ভাঙা জার্মান বলে নিজেদের বাহাদুরি জাহির করতাম। আজমের বিশ্লেষণ শক্তি গভীর ও একটু অদ্ভুত ছিল। যেমন- 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা' গানটি গেয়েছেন দুজন- হেমন্ত ও লতা। ঐ দুজনের গানের পার্থক্য আজমের মতে একজনের গান ক্লক্ ওয়াইজ্ গতিতে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছে, আর একজনের অ্যান্টি ক্লক্ ওয়াইজ্ চক্রাকারে ঘুরে ভিতর থেকে বাইরে আসছে! মর্মটা এখনও আমার বোধগম্য হয়নি। ভট্‌ভটিয়া ঢাকা ল-এর সুবাদে বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডাগুলো নিয়মিত জমত। আর সেই অত্যাচারের প্রধান শিকার ছিল আমাদের বন্ধু মহলে একমাত্র দম্পতি আজম আর পুতুল। পিলখানায় দেড় কামরার ভাড়া বাড়িতে নব-দম্পতি এই কপোত কপোতীর ডেরা। ওখানেই আমাদের তাসের আড্ডা, সিনেমার প্ল্যান, চাইনীস্ খাবার উদ্যোগ- সবই।

একদিন অতি ভোরে আমাদের আজিমপুরের মেস্ বাড়িতে আজম একটা লুঙ্গি পরে হাজির। আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল-
'দেখি তোর প্যান্ট শার্ট কোনটা আমায় ফিট্ করে।'
'কী ব্যাপার? কী হ'ল?' আমি কৌতূহলভরে প্রশ্ন করি।
সে বলে 'আরে, কাল রাতে আমাদের পিলখানার বাড়িতে সব সাফ্ করে দিয়ে গেছে।
'মানে চুরি হয়ে গেছে? তোরা কেউ বুঝতে পারলি না? ক্লোরোফর্ম করেছিল নাকি?'
'বুঝতে পারলাম না মানে! আমরা তো সব দেখেছি মশারির ভিতর থেকে!'
'তাহলে?'
'তাহলে আবার কী। আমাদের দারুণ ভূতের ভয়, আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে ওটা একটা ভূত!'
কী আর করা! চোর বা ভূতের কান্ড! আমার সাইকেলের পিছনে সাধারণতঃ কেউ বসতে চাইত না, কখন আবার তাকে ঠেলতে হয়! কিন্তু প্রায় নিরুপায় হয়ে আজম আমার সাথে বাজার করবার জন্য আমার ভট্‌ভটিয়ার পেছনে চড়ে যেতে রাজি হ'ল।

মনে হয় সেই সময়টা যেন স্থির হয়ে রয়েছে আর ঘটনাগুলো ঘটছে একই মঞ্চে। রাজনৈতিক ইতিহাসে এ সময়টা ছিল এক দারুণ উত্তাল সময়! শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন তুঙ্গে। আগরতলা কেস্ থেকে বেরিয়ে আসবার পর শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা শীর্ষে। ঢাকা শহরে প্রায়ই লেগে আছে ১৪৪ ধারা, হরতাল, মিছিলের উপর পুলিশের হামলা, লাঠিচার্জ আর কাঁদুনে গ্যাস্ প্রয়োগ। আমি আর আমার সদা সঙ্গী ঢাকা ল-কে মাঝে মাঝেই অলিগলিতে ঢুকতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। ভিয়েৎনাম যুদ্ধও তখন তুঙ্গে। সায়গন, হাইফং বোমার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

জগন্নাথ কলেজের টিচার্স রুমের আলোচনাগুলো ছিল দীর্ঘ আর অস্থির। ছিলেন প্রবীণ অধ্যাপক অজিত গুহ, বাংলার অধ্যাপক রাহাত খান, পলিটিক্যাল্ সায়েন্সের বোরহানুদ্দিন, ম্যাথামেটিক্সের আজাদ কালাম প্রমুখ। এঁদের অনেকেই পাক বাহিনী বা রাজকরদের হাতে বুদ্ধিজীবী-নিধন যজ্ঞের বলি হয়েছেন। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ এক শব্দে বলা যেত bleak. আইয়ুব খানের পতন অবশ্যম্ভাবী! এমন সব আবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে আমরা একটু মরূদ্যান খুঁজেছি একে অপরকে সঙ্গ দিয়ে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছর ছয় সপ্তাহের জন্য একটা সামার সায়েন্স প্রোগ্রাম থাকত। কলেজ শিক্ষকরা এখানে ছাত্র, আর ক্লাসে পড়াতে আসতেন দু-একজন আমেরিকান প্রফেসর। ১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আমাকে পাঠানো হয় সেখানে। সকালে ঢাকা ল-৮৫৬৪-এর মনমাতানো শব্দে বাতাস ভারী করে, কেমেস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পেছনে এক গাছের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে ক্লাসে যোগ দিই। এখানে কয়েকজন আমেরিকান প্রফেসরদের সাথে পরিচয় হয়- ডঃ জন্ বেয়ার, ডঃ ইবি ম্যাকেল্‌রাথ্ ও ডঃ জিম্ কক্স। এঁদের আমেরিকান, বিশেষতঃ টেক্সান উচ্চারণ বুঝতে বেশ বেগ পেতে হ'ত। ক্লাসে বা ল্যাবোরেটরিতে তাও রাসায়নিক ভাষা দিয়ে চলে যেত কিন্তু অবসর সময়ে সাধারণ আলোচনায় বিশেষ সমস্যা দেখা দিত। সেটারও একটা সুরাহা হয়ে গেল। একদিন ডঃ কক্স আমাকে কি জানি বলছিলেন, আমি সেটা না বোঝায় তিনি কিছু অঙ্গভঙ্গির আশ্রয় নিলেন। দুটো হাত মুঠো করে সামনে বাড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখে ভুরুম্ ভুরুম্ শব্দ করলেন, অর্থাৎ আমিই কি ওই ভট্‌ভটিয়ার মালিক? উৎসাহভরে উত্তর দিই- অবশ্যই! তাঁর সাথে পরিচয় ও সুদীর্ঘ সম্পর্কের সেখানেই সূত্রপাত। পরে তিনি আমাকে গ্র্যাজুয়েট্ স্টুডেন্ট হিসাবে ভর্তি হতেও উৎসাহ দেন। সেটা ছিল ১৯৬৮ সাল। মার্টিন লুথার কিং নিহত হলেন, তারপর আততায়ীর হাতে নিহত হ'ন রবার্ট কেনেডি- সে সংবাদ আমরা সবাই একসাথে নীরব, নিস্পলক মুহূর্তে শুনেছিলাম।

ডঃ কক্স ঢাকা থেকে চলে যাবার আগে তাঁকে ঢাকা শহরটি ঘুরিয়ে দেখাবার আমন্ত্রণ জানাই। অনায়াসেই রাজি হন তিনি। কিছু বোঝার আগেই আমাকে তাক লাগিয়ে কুল্লে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির সেই প্রফেসর আমার মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে বসলেন। প্রমাদ গুণলাম! যে সাইকেলে আমার দেশী বন্ধুরা উঠতে নারাজ, সেখানে ইনি! বুঝলাম ignorance is bliss! যাইহোক, এই আমেরিকান মানুষটিকে পিছনে বসিয়ে আমার দূত সশব্দে ছুটে চলল পুরনো ঢাকার গলি, মসজিদ, সদরঘাট নওয়াব বাড়ি সব জায়গায়। বাসের ধোঁয়া আর ধুলোয় ধূসর এই অভিযানটি যে এক রোমাঞ্চকর স্মৃতির সৃষ্টি করল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৬৯-এর প্রথমদিকে বাঙালিরা ফেটে পড়েছিল আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে, এক-নায়কত্বের বিরুদ্ধে। নামকা ওয়াস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'ল ইয়াহিয়া খানের কাছে। পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলির হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধামাধরা গভর্ণর মোনায়েম খাঁ-র বিরুদ্ধে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনাতে প্রতিদিনই চলছে মিছিল। নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন আমার আরো অনেক শিক্ষকরা, তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি-অধ্যাপক, শামসুজ জোহা। বিক্ষোভ, হরতাল আর প্রতিবাদের মুখে ১৯৬৯ সালে ২১-শে ফেব্রুয়ারীকে প্রথমবারের মতো শহীদ দিবসের মর্যাদা দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর কেটে গেছে দীর্ঘ সাতেরো বছর। বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংবিধানে স্থান পেলেও পায়নি তার প্রকৃত মর্যাদা। পাকিস্তান সরকার কখনই শহীদ দিবসকে স্বীকৃতি দেয়নি। ষাটের দশকে আমরা অনেকেই রাতের অন্ধকারে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছি হাতে লেখা পোস্টার- 'শহীদ দিবস অমর হোক'। ভোরের শিশিরে পোস্টারগুলো থেকে সস্তা লাল রঙ গড়িয়ে পড়ত রক্তের ধারার মতো। ২১-শে ফেব্রুয়ারী আর লুকিয়ে পালন করতে হবে না!

সেদিনের সকালটা ছিল ঢাকার যে কোন অন্যান্য সকালের মতই। একটু কুয়াশায় ঢাকা, বাতাসে শীতের আমেজ। ভোরের আকাশে কিছু হালকা মেঘের পাল ধীর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। তখনও কর্ম কোলাহল শুরু হয়নি। দোকানপাট খোলবার সময় হয়নি তখনও। কোথাওই কোনও অসামান্যতার বা অস্বাভাবিকতার আভাস ছিল না। আপাত দৃষ্টিতে সেটা একটা গতানুগতিক দিন বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে কি তাই! কাকডাকা সেই ভোরে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে, খালি পায়ে আমরা অনেকে জড়ো হলাম মেডিক্যাল কলেজের পাশে, অসমাপ্ত শহীদ মিনারের সামনে। অসাধারণ লেগেছিল সেই দিনটি! কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধবণিতা

নীরবে হাতে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে চলেছে শহীদ মিনারের দিকে। কারো হাতে সাদা বেলিফুলের মালা, কারো হাতে হলুদ গ্যাঁদা, ছোট শিশুর ছোট্ট হাতের মুঠিতে ভরা ভোরের কিছু শিউলি, বকুল ফুল। সবই শহীদ মিনারের অর্ঘ্য- স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাঞ্জল ও ঐকান্তিক! সে দৃশ্য ভুলবার নয়। এই অদ্ভুত নীরব পরিবেশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আরেক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। লাল গামছায় একটা হারমোনিয়াম বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে জাহেদুর রহিম 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গাইতে গাইতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন। স্রোতের মতো লোকজন এসে যোগ দিচ্ছে তাঁর পিছনে। আমরাও গল্পের পাইড্ পাইপারের মতো নীরবে এগিয়ে চললাম তাঁর পিছনে আজিমপুর গোরস্থানের দিকে, যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত সালাম, বরকত, রাফিক!

সেদিন রাতে ঢাকা স্টেডিয়ামে বসে আছি আপামর জন-সমুদ্রে, সেখানেও পাশে আমার সঙ্গী ঢাকা ল-৮৫৬৪। মঞ্চের মাঝখানটা ছাড়া আর কোথাও কোনো আলো নেই। জনসমাবেশ স্তব্ধ, মুগ্ধ! মাইকে সমবেত স্বরে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কী ভুলতে পারি...?' আমি সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে জেনেছি- আমি পারি না। একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ আমার কাছে একটি সাধারণ দিনের ফ্রেমে বাঁধানো একটি অবিস্মরণীয় দিন হয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল।

কিছুদিন হ'ল আজম ঢাকা থেকে বদলি হয়ে চলে গেছে ময়মনসিং-এ। এখনকার কর্মব্যস্ত ত্রিশাল-ভালুকা রাস্তাটি আজমের তত্ত্বাবধানে তৈরী। নতুন রাস্তা বানাতে গিয়ে তরুণ এঞ্জিনিয়ারটি হাত ভাঙল গাড়ি উলটিয়ে। সময়ের চাকা ঘুরছে অবিরত। মানুষ প্রথম চাঁদে পদার্পণ করল। রাতারাতি নিউ মার্কেট আর হাইকোর্টের ফুট্‌পাথে অ্যাপলো ১১-র টি-শার্ট, হাত-ব্যাগ আর স্যান্ডেল বিক্রি হতে শুরু করল। সেই সঙ্গে আমার জীবনেও এক নতুন পরিবর্তিত অধ্যায় শুরু হতে চলল।

অগাস্ট মাসে ঢাকার তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে পাড়ি দিলাম এমন একটি শহরের উদ্দেশ্যে, যার নামের উচ্চারণ আমার অনেকদিন পর্যন্ত ঠিকমত জানা ছিল না। 'হুস্টন' না 'হাউস্টন'- যার আসল উচ্চারণ 'হিউস্টন'! পকেটে পাকিস্তান সরকারের বরাদ্দ সর্বসাকুল্যে চার ব্রিটিশ পাউন্ড। সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় উপহার হিসাবে দেওয়া একটি অ্যাটাচি কেস্। ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটিতে মহিউদ্দিন ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কয়েক পাউন্ড আধ-সেদ্ধ খাসির মাংস, লন্ডনে ওর ভাই কামালের জন্য, সেখানে আমার দুদিনের ব্রেক্ জার্নি। একটু পরেই তেজগাঁ বিমান বন্দর হারিয়ে গেল আমার দৃষ্টির বাইরে। সামনে অজানার আহ্বান, অজানা এক বন্ধুবিহীন, আত্মীয়হীন দেশের উদ্দেশে!

ও আচ্ছা, আর আমার ঢাকা ল-৮৫৬৪-এর কী হল? আমার যাত্রা-সংবাদ পেয়েই আমার দুজন সহকর্মী ওটা কিনতে চাইলেন। একজন দাম দিতে চাইলেন ৫০০ টাকা আর অন্যজন ৩০০। আমি ওই ৩০০-তেই সাইকেলটা বিক্রি করেছিলাম। সেই জেনে অন্যজন রেগে গেলেন, বললেন 'এ কেমন কথা! আমি তো আপনাকে বেশী দাম দিতে চেয়েছিলাম।' তাঁকে ঠান্ডা মাথায় বোঝালাম- 'দ্যাখেন, ওটার পেছনে মেরামত বাবদ অনেক খরচ আছে। মনে হয়, আপনাকে আমি অনেক নাজেহালের হাত থেকে রক্ষা করলাম।'

আমার সেই নিত্যসঙ্গী ঢাকা ল-৮৫৬৪-এর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম- 'সাবাস, বাঘের বাচ্চা, তোমাকে পাবার জন্যেও কেউ লড়ছে!'

....❋....❋....❋....

মনসঙ্গীত (২)

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

শরণে রাখিও সদা
শরণে রাখিও।
নয়নে রাজিও সদা
নয়নে রাজিও।

বচনে ভরিও সুধা
মননে রচিও ক্ষুধা
স্মরণে ঘুচিও দ্বিধা
অশুচি ঘুচিও।

পরশে আনিও শুচি
পরনে দিও গো রুচি
করমে ছন্দে-তানে
ক্লান্তি ঘুচিও।

শয়নে থাকিও সখা
স্বপনে দিও গো দেখা
জাগিলে প্রেমের রেখা
শ্রবণে ঢালিও।

....❋....❋....❋....

এগারোর গেরো

পরম বন্দ্যোপাধ্যায়

বারো এবং তেরো দুটো সংখ্যাই খারাপ জানতুম। বারোটা বাজা মানে তো সবাই জানে, আর খ্রীষ্টান মহলে তেরোও অপয়া কারণ যীশু খ্রীষ্টকে রোমান সৈন্যদের কাছে ধরিয়ে দেবার জন্যে যে শিষ্য সঙ্কেত করেছিলেন, তিনি জুডাস, ইহুদীদের পূর্বপুরুষ, তিনি ছিলেন তেরো নম্বর শিষ্য। কিন্তু এগারোরও যে গেরো ছিল তা জানলুম মাত্র এই সেদিন।

কর্মজীবনের প্রথম নয় বছর জাহাজে কাটিয়ে তারপর লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে এসেক্সের টিলবেরী ডকের কাছেই একটি জাহাজ সারাই কারখানায় কাজ করে অবসর নিয়ে ঐ অঞ্চলেই বসবাস করছি। এত বয়সে দেশে ফেরার প্রশ্ন আসে না। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কে যে কোথায় ছিটকে গেছে তার ঠিক নেই, কজন বেঁচে আছে তাই বা কে জানে, সুতরাং বহু দিনের অভ্যেস হিসেবে মাসে গোটা দুই শনিবার সন্ধ্যায় কাছের পাব্-এ গিয়ে এক মগ বীয়ার নিয়ে বসি। সেদিনও বসেছি। সময়টা জানুয়ারীর শেষে বিলেতের ঠান্ডা, তার সঙ্গে টেম্স্ থেকে উঠে আসা কুয়াশা ইত্যাদি মিলে ঠান্ডাটা বেশ জমিয়ে পড়েছে। দেখলুম লোক বেশ কম, খুব পরিচিত কাউকে দেখলুম না। দুজন আধা বা খুব সামান্য পরিচিতকে দেখলুম, দুজনেই খুব উত্তেজিতভাবে রাজনীতির আলোচনায় মেতেছে, সুতরাং ওদিকে ভিড়লুম না। টেম্সের ধার ঘেঁষে একটি ছোট দুজনার মত টেবিল খালি পেয়ে বসলুম। নদীতে ছোট ছোট লঞ্চ, গাদাবোট চলাচল দেখছি, হঠাৎ দেখি সামনেই এক ভদ্রলোক, হাতে আধখালি একটি মগ- আমার অনুমতি চাইছেন আমার টেবিলে বসার জন্যে। বললুম- 'বসুন বসুন। আজ বেশ লোক কম দেখছি।'
- হ্যাঁ। বাড়ির আরাম ছেড়ে বেরোতে চায় না বোধহয়। আমি জেম্স্ ওয়ালটারস্, জিম্ বলে ডাকতে পারেন।
- আমি বিজন রায়, জন্ বলে ডাকতে পারেন।

লক্ষ্য করলাম জামা-কাপড় বেশ দামী কিন্তু কোটের কনুই ও হাতার গোড়ায়, প্যান্টের হাঁটুর কাছে ও তলায় একটু জীর্ণতার লক্ষণ। বয়স আমারই মতন, সুতরাং হিপিদের মতন ছেঁড়া জামা-কাপড় পরার ফ্যাশন নয় বোধহয়। মনে হ'ল এককালে অবস্থা ভালো ছিল, এখন হয়ত একটু টান পড়েছে। তবে এদেশে রিটায়ার করলে পেন্শন্ ও সরকারী ভাতা মিলে তো এ দশা হবার কথা নয়! অবশ্য মদ ঘোড়া ইত্যাদির ঝোঁক থাকলে নবাব খাঞ্জাখাঁর সম্পত্তিও ফুঁকে দিয়ে এই অবস্থা হতে পারে। যাক, এ সব প্রশ্ন রীতি বিরুদ্ধ। আবহাওয়া, দেশের অবস্থা, চাঁদে মানুষ নামা এসব আলোচনার পর ভদ্রলোক হঠাৎ পকেট থেকে একটি পুরনো রিস্ট-ওয়াচ্ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা রেখে আমায় ১০ পাউন্ড ধার দিতে পারেন?' ঘড়িটি টেবিল থেকে না তুলেও এক নজর দেখেই চিনলাম বেশ সৌখীন ঘড়ি এবং এখন ওটির অ্যান্টিক দামও ভালো হবে। আমি ঘড়িটিতে হাত না দিয়ে পকেট থেকে দুটি ৫ পাউন্ডের নোট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম- 'ঘড়ি রাখার দরকার নেই, আপনাকে এমনিই ধার দিলাম। আমি নিজেই খুব গোছানো নই, হয়ত ভেঙে ফেলব বা হারিয়ে ফেলব। তাহলে আপনাকে ফেরৎ দোব কোত্থেকে? সাধারণ ঘড়ি নয় যে বাজার থেকে কিনে দোব।'
- সাধারণ ঘড়ি নয়, বলছেন কেন?
- আমি ঘড়ি খানিকটা চিনি। আমি যদিও এঞ্জিনিয়র কিন্তু আমার মামার একটি ঘড়ি সারাইয়ের দোকান ছিল রাধাবাজারে, কলকাতার প্রধান ঘড়ি পট্টিতে। গ্রীষ্মের বা পুজোর ছুটিতে মামা মাঝে মাঝে ওখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখত। তখন নানান মেক্-এর, নানান কম্পানীর, নানান ডিজাইনের ঘড়ি আসত সারাইয়ের কাজে, তাই থেকেই আগ্রহ হয়। পরবর্তী জীবনেও একটু আগ্রহ থেকেই গেছে। আপনার ঘড়িটি মনে হচ্ছে exclusive. ওমেগার, তাই কি?
- হ্যাঁ। আপনি ঘড়ি ভালই চেনেন, এবং এই ডিজাইনের ঘড়ি তৈরীর একটা ইতিহাস আছে, জানেন কিনা জানি না।
- হ্যাঁ, কিছুটা জানি। ফরাসী দেশের বিখ্যাত ধনী মারকুইস্ দ্য লি অঁ-র অর্ডারে ওমেগা কম্পানী এই ঘড়িটি তৈরী করে এবং বাজার এটি কীভাবে নেয় দেখার জন্যে মাত্র দেড়শোটি ঘড়ি বাজারে ছাড়ে। তখনকার কালের পক্ষে দাম খুব বেশী হওয়ায় ভালো বিক্রী হয়নি। দেড়শোটি ঘড়ি বেচতে দেড় বছর লেগে যায়, সুতরাং আর ওই ঘড়ি তৈরী করেনি তারা।
- ঠিক। তার পরের ইতিহাসটিও জানেন নিশ্চয়ই?
- না। তার পরের ইতিহাসটি জানি না।
- চল্লিশ বছর আগেকার ঘড়ি এখনও সুন্দর সময় দিচ্ছে। মাত্র তিনবার অয়েলিং করিয়েছি। আমি নিজেই পেয়েছি ১৯৩৮ সালে লড়াইয়ের ঠিক আগে। কিন্তু এখন ওই দেড়শোর মধ্যে মাত্র নটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাকিগুলো হয়ত মালিকদের অজ্ঞানতায় ফেলে দিয়েছেন। ওমেগা কম্পানীর মিউজিয়ামে একটি, জেনেভার ওয়াচ্ মিউজিয়ামে একটি, টেক্সাসের এক ধনী পেট্রোল কম্পানীর মালিক বা যাকে ওরা বলে 'তৈল-চুম্বক', তাঁর কাছে আছে দুটি, প্যারিসের বড় ঘড়ির দোকানের মালিক সাঁজ্ এলিসের জাঁ রুবোঁর কাছে চারটি আর আমার কাছে একটি। রুবোঁ এবং তৈল-চুম্বক দুজনেই জানেন আমার ঘড়িটির কথা এবং দুজনেই ভালো দামও দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি এটি বেচতে চাই না, কারণ এই ঘড়িটি আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ ছিল এবং আমি এই ঘড়িটি আনার পর ওর এত পছন্দ হয় যে ও নিজে হাতে এটি আমাকে পরিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন পাঁচ বছর আগে। আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি, আমি তখন অন্য জায়গায় ছিলুম।
- শুনে খুব খারাপ লাগল। খুবই দুঃখের স্মৃতিচিহ্ন এই ঘড়িটি। আপনার স্ত্রীর পরিয়ে দেওয়া, আপনি রেখে দিন। টাকাটা সুবিধা মত ফেরৎ দেবেন আমি এখানে মাসে গোটা দুই শনিবার সন্ধ্যায় আসি। মানুষকে আমি খানিকটা বিশ্বাস করি। কখনও বিশেষ ঠকিনি। তবে একটা কৌতূহল হচ্ছে, যদি মাপ করেন তো বলি।
- নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বলুন।
- এখন হয়ত আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু ঘড়িটি তখনকার কালেও খুবই দামী ছিল, তখন আপনারা এটি কিনে থাকলে আপনার আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল বুঝতে হবে। তাহলে আজ আপনার এই অবস্থা কেন বা কি করে হ'ল?

- আজ্ঞে, দোষ আমারই পুরোপুরি। ষোলআনা বলতে পারেন। না, মদ, ঘোড়া বা মেয়েছেলে ওসব কিছু নয়। ও কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু এর ইতিহাসটি একটু লম্বা আপনার কি শোনবার সময় হবে?
- কি আশ্চর্য! অবসরপ্রাপ্ত লোকের আবার সময়ের অভাব কি? দাঁড়ান, আপনার ও আমার মগদুটি ভরে আনি।

মগ ভরে আনার পর ভদ্রলোক শুরু করলেন,
- দেখুন, এই ঘড়ির জন্যেই আমার আজকে এই দুর্দশা।
- এই ঘড়িটির জন্যে?
- না না, এই ঘড়িটির জন্যে নয়। ঘড়ির জন্যে। একটি লোকের লোভের কাহিনী বলি। একটি লোক ছিল, তার নাম অ্যালবার্ট আর্থার, আজ থেকে বছর ১০ আগেও 'ইমপ্রেশারিও' হিসেবে বাজারে তাঁর খুব নাম ছিল। ইমপ্রেশারিও জানেন তো?
- জানি। যারা গান বাজনা ইত্যাদির দলকে এক শহর থেকে অন্য শহরে এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে আনা-নেওয়ার ব্যবসা করে ও শো করে, দালাল বা এজেন্ট গোছের।
- ঠিক। এই অ্যাল্ আর্থার খুব বড় ইমপ্রেশারিও ছিলেন। প্রথম জীবনে ইংল্যান্ড, স্কট্ল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের শহর থেকে ভালো ভালো আর্টিস্ট এনে অন্য শহরে শো করতেন। ক্রমশঃ ইউরোপ থেকে ব্রিটেনে বা ব্রিটেন্ থেকে ইউরোপে ওনার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হ'ল। বিশ্বব্যাপী মন্দারও কয়েক বছর আগে নিজের মোটর গাড়িতে ইউরোপ যাতয়াত করতেন চ্যানেল্ ফেরীতে। ট্রেনে, ক্যালে, ডান্কার্ক বা অস্টেন্ড থেকে প্যারিস্, জুরিখ্ বা বার্লিন্ যাওয়ার বহু অসুবিধা। ট্রেনের সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা, সেখানে নেমে ট্যাক্সি ধরা ইত্যাদি। তখনকার যুগে গাড়িভাড়া করার কম্পানী ছিল না, লোকের এত পয়সাও ছিল না, তাই ট্যাক্সিই ছিল সম্বল। কিন্তু অ্যাল্-এর যথেষ্ট রোজগার ছিল, তাছাড়া কাজেরও প্রচুর সুবিধে হ'ত, প্রেস্টিজের প্রশ্নও ছিল। যাইহোক, লোকের রোজগার প্রচুর হলেও সে আরও আরও চায় এবং অ্যাল্ও তাই চেয়েছিলেন। সেই সময় জেনেভার এক ছোট ঘড়িওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে তার কুপরামর্শে ডিউটি ফাঁকি দেওয়া ঘড়ি বিলেতে আনার চোরা কারবার শুরু করলেন। সেই ছোট দোকানদারের আবার এক বড় ঘড়ির দোকানদারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তখন সুইজারল্যান্ডে ঘড়ির শুল্ক ছিল ১০% এবং ইংল্যান্ডে ৫০%। অর্থাৎ ১০০ টাকা কারখানার দাম, সুইজারল্যান্ডে ১১০ টাকা, বিলেতে ১৫০ টাকা। এই ছোট দোকানদার সেই ঘড়িটি ১০০ টাকা দামেই অ্যাল্কে দিত। সুইজারল্যান্ডের ১০% ডিউটিও ফাঁকি দিত। কিভাবে, তা অ্যাল্ জানেন না বা জানার দরকারও ছিল না। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। এই ছোট দোকানদারের এক ছেলের একটি মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানা ছিল। তাকে দিয়ে অ্যাল্-এর গাড়ির ১২ গ্যালন পেট্রল ট্যাঙ্কের মাঝখানে ১টি পার্টিশন ঝালাই করিয়ে ওটিকে ২ গ্যালন ও ১০ গ্যালনে দুটি ভাগ করিয়েছিলেন। দুটি ভাগের মধ্যে নল ও ঐ নলে খোলা বন্ধের কল লাগিয়ে এমন ব্যবস্থা করেছিল যে ইচ্ছে মতন কেবল ২ গ্যালনের ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে ১০ গ্যালনে ঘড়ি ভরে বিলেতে ফেরা যায়। আবার অন্য সময় ১২ গ্যালন পেট্রোল ভরেই চলাফেরা করা যায়। এইভাবে বছর দুই বেশ চলল। তারপর একবার ঘড়ি এনে তার মধ্যে বেশ কিছু ঘড়িতে দম দিয়ে চালু করতে পারলেন না। তখনও ব্যাটারির ঘড়ি বেরোয়নি, সবই ছিল দম দেওয়া। সেই মাল দিয়েছিল ঐ দোকানের মালিকের ছোট ছেলে। কারণ মালিকের শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে মালিক অন্য শহরে সস্ত্রীক চলে গিয়েছিলেন। নভেম্বরের গোড়ায় অ্যাল্ পরের খেপের মাল আনতে গিয়ে মালিকের ছেলেকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিল। ফলে সেবারের সব ঘড়ি ছেলেটি ভাল করে চেক্ করে, দম দিয়ে দিল। ক্যালে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। ডোভারেও পাস্ হয়ে গেল। কাস্টম্ অফিসার তাঁর গাড়ির ভেতর ও বুটের ডালা খুলে দেখে গাড়ির সামনের কাঁচে খড়ি দিয়ে সই করে দিলেন, অর্থাৎ পাস। তারপর, সামনের গাড়িটি তখনও সামনের অফিসার দেখছেন এবং তিনি সই করে ছেড়ে দিলে অ্যাল্ এগোবে। কাস্টম্ অফিসারের সঙ্গে অ্যাল্ কিছু মামুলি কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় ডকের সাইরেন্ বেজে উঠল। 'অ্যাঁ...'। এটি এয়ার রেডের সাইরেন্ নয়। প্রথম লড়াই তখন শেষ হয়ে গেছে। এ সাইরেন্ সেই শান্তি দিবসের স্মৃতি হিসেবে পালন করা হয়। ১৯১৮-র ১১ই নভেম্বর জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। তাই ওই তারিখে সকাল ১১টা বেজে ১১ মিনিট ১১ সেকেন্ডে (এবং ১১তম মাসে) প্রতি বছর দুমিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। অ্যাল্-এর মনে পড়ল হ্যাঁ, আজ ১১ই নভেমম্বর বটে। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। ব্যস্ত কর্মচঞ্চল ডক্ একবারে নিশ্চুপ। সবাই অ্যাটেন্শনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সব ক্রেন্, মেশিন, ফর্ক লিফ্ট ট্রাক সব বন্ধ। আল্পিনটি পড়লেও শোনা যাবে। আল্পিন অবশ্য পড়ল না, কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। সেই ২ মিনিট নিস্তব্ধতা ভেদ করে ১০ গ্যালন ট্যাঙ্কের ৩৩৬টি ব্যান্ডহীন দম দেওয়া রিস্ট ওয়াচের টিক্টিক্ তখন অ্যাল্ এবং কাস্টমস্ অফিসার দুজনেরই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছে। দু মিনিট নীরবতার পর তিনবার সাইরেনে ছোট ধ্বনি অ্যাঁ- অ্যাঁ- অ্যাঁ হতেই আবার কাজকর্ম শুরু হ'ল। এবং কাস্টমস্ অফিসার অ্যাল্-এর গাড়ির বনেটটি খুলে আওয়াজ অনুসরণ করে পেট্রোল ট্যাঙ্কে পৌঁছলেন। অ্যাল্ ধরা পড়ে গেল।
আমি বললাম- 'বুঝলাম। আপনিই তাহলে সেই বিখ্যাত ইমপ্রেশারিও অ্যাল্ আর্থার। এবার মনে পড়ছে বটে কাস্টমসে কিছু ফাঁকি দেওয়ায় আপনার কয়েক বছর জেল হয়। বোধহয় বছর পাঁচেকের!'
- হ্যাঁ পাঁচ বছরটা ঠিক, কিন্তু আমি অ্যাল্ নই। আমি কাস্টমস্ অফিসার জিম্ ওয়াল্টার্স, আমার হয় পাঁচ বছর আর অ্যাল্-এর হয় দুবছর। অ্যাল্ খুব বলিয়ে কইয়ে ছিলেন। ঐখানেই আমাকে কথায় মোহিত করে ওঁর দলে টেনে নেন, ওঁর শেয়ার বারো আনা আমার চার আনা। ওঁর মূলধন, পরিশ্রম সবই- আমার খালি সই করা।
- বাঃ! আসল চোরের দুবছর, আর সাহায্যকারীর পাঁচ বছর?
- হ্যাঁ। কারণ সরকারী উকিল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে অ্যাল্ চোর ঠিকই, কিন্তু আমি সরকারী দারোয়ান হয়ে দারোয়ানি তো করিইনি, উল্টে চোরকে সাহায্য করেছি, সুতরাং...। হ্যাঁ, পাঁচ বছরের জেল ছাড়াও আমার কাস্টমসের পেনশেনটিও বাতিল হয়ে যায়। এখন খালি সোশ্যল্ সিকিউরিটি বৃদ্ধ-ভাতার ওপর টিকে আছি।'

....❋....❋....❋....

দোষারোপ
মালবিকা চ্যাটার্জী

ভাবছিলাম পৃথিবীর এই দুরবস্থার কথা। চারিদিকে কতই না হাহাকার! আজকের পৃথিবীতে এত যে সব অশান্তি, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সব দোষ আদপে মানব জাতির সেই প্রথম দুই মানব মানবী- আদম আর ইভের। তাঁরা দুজন সারাদিন ইডেনের উদ্যানে হেসে-খেলে বেড়াতেন। ঈশ্বর তখনও তাঁদের মনে কোনরকম ভাবাবেগের বীজ বপন করেননি। কেন, তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়, যদি তাঁর ইচ্ছা ছিল যে সেই দুটি প্রাণী চিরকাল তেমনই নির্মল থাকবে তাহলে ওই অল্প একটুখানি নিষেধ না মানার বাসনাই বা কেন তাঁদের মনের অতলে রেখে দিয়েছিলেন! মনোরম স্বর্গীয় পরিবেশে তাঁরা দিব্যি ছিলেন। সেই ইডেন বাগানে নানারকম ফল ও সবজির গাছও ছিল, সে সবই আদম ও ইভ ইচ্ছামত খেতে পারতেন, শুধু একটি গাছেরই আপেল খেতে নিষেধ করেছিলেন ভগবান, যে গাছটি ছিল সংজ্ঞার আধার। সে গাছের আপেল খেলে অবশ্যম্ভাবী জীবনের শান্তিতে ভাঁটা পড়বে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এতই যদি নিষেধাজ্ঞা, তাহলে সেই আপেল গাছটা উপড়ে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যেত। নাকি তিনি চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চৈতন্যের উদয় হোক? হয়ত বা ঈশ্বর নিজেই তখন বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছিলেন! কেবলমাত্র দুটি মানুষ নিয়ে তিনি কীই বা করতেন, ক্রমাগত তাঁর কাজ চালাতে গেলে আরো রসদ চাই যে! পরীক্ষা চালানোর এমন আধারও তো তাঁরই সৃষ্টি! এ যুগের চলতি কথা- দিনে একটা করে আপেল খেলে নাকি ডাক্তারদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়। এও সেই আপেলের ব্যাপার! যে আপেল খাবার জন্য ডাক্তারের সৃষ্টি হয়েছিল, আবার আপেল খেয়েই তাদের দূরে সরিয়ে রাখার কথা! সেই পুরাতন আপেলের মহিমা!

যাইহোক, এক সরীসৃপ, যাকে বাইবেলে শয়তানের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, সেই গাছটিরই আপেল খাবার জন্য তাঁদের উস্কানি দিত বারবার, কিন্তু আদম ও ইভ কখনই ঈশ্বরের নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা ভাবতেও পারেননি। কিন্তু ওই যে এক ছোট্ট নিষেধ না মানার বীজ তাঁদের শরীরের কোথাও একটা বপন হয়ে গিয়েছিল! একদিন সেই সাপের কারসাজিতে আদম ও ইভ ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে সেই গাছের আপেল শুধু একটু চেখে দেখতে চাইলেন, আর- ব্যাস! সেখানেই নির্বিঘ্ন জীবনের বিসর্জন হয়ে গেল। সঞ্চার হ'ল নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতির, যেন এতদিনে তাঁদের বোধোদয় হ'ল। লজ্জা, সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা ইত্যাদি সব হুড়মুড় করে উপচে উঠল। শুরু হ'ল হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং আরও অনেক রকম বিদঘুটে অনুভূতি, যা মানব মনে ও হৃদয়ে যুতসই একটা জায়গা তৈরী করে ফেলল চট্ করে। এতকাল পরেও আমরা সেই তমোগুণগুলোকে পছন্দ না করলেও সরিয়ে ফেলতে পারিনি। মনে হয় এইসব অনুভূতিগুলো যেন আরো পেয়ে বসছে দিনে দিনে।

আদম, ইভ ও সেই সরীসৃপের বেয়াদপির ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাদের ভয়ানক শাস্তি দিলেন। মানব সারাজীবন খাটবে, মানবী সন্তান ধারণ করবে, আর সরীসৃপ সর্বদা জমিতে লেপ্টে থাকবে। তাতে অবশ্য কারো কোন ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। মানব ও মানবী তাদের আপন সত্তায় খুশি, সাপের মনের কথা বলতে পারি না। বিষধর সাপ ছোবল দিলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে- এতটুকুই জ্ঞান আমার সাপ সম্পর্কে আছে। ওই জীবটি আমার খুব পছন্দের জীব নয়। পুরাণ অনুযায়ী মানুষের মনে টাল-মাটাল অবস্থা আনার জন্য ওই জীবটির অবদানও কিছু কম নয়!

আমাদের মা, ঠাকুমার কাছে কতবার শুনেছি 'ঘোর কলি' কথাটা। ওই নিয়ে কখনও ভাবিনি, ছোট ছিলাম, ছোটবেলায় তো কোন গুরুতর ভাবনা থাকে না। বড়রা সর্বদা আড়াল করে রাখে সব বিপদ থেকে। যখন আস্তে আস্তে জীবন পরিণত বয়সের দিকে এগোয় তখন নজরে পড়ে বিভিন্ন রকম ঘটনার বিচিত্রতা। অপরিণত বয়সের সরলতা ধীর পদক্ষেপে বিদায় নেয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অভিযানে।

অভিজ্ঞ মন কি বলবে এও ঘোর কলি? পৃথিবী এখন উন্নতির এমন সীমায় যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসের কোনরকম আভাস থাকলেই তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে কু-এর বাসা তার সন্ধান কতখানি রাখা সম্ভব আর বিপদ ঘটার আগে কতটাই বা সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব, সেটাই প্রশ্ন। তাই নিউ ইয়র্কের টুইন্ টাওয়ার যখন অসংখ্য মানুষের চোখের সামনে কয়েক হাজার মানুষকে নিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়েছিল, শুধু কিছু মানুষের আক্রোশের দরুণ, তখন আমরা চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই কি করতে পেরেছি! যখন বস্টনের অতি সুন্দর একটা দিনে হাজার হাজার মানুষ ম্যারাথন দৌড়তে মত্ত আর রাস্তার ধারে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা ও উৎসুক দর্শকরা ভিড় জমিয়েছিল, তখন কেন কিছু মানুষের মতি হ'ল সেই আনন্দ-ধারায় রক্তধারা বইয়ে দেবার! ভারতে অযোধ্যা কান্ড, বম্বের বিভিন্ন জায়গায় আততায়ীদের হামলায় শ'য়ে শ'য়ে মানুষের মৃত্যু, কার্গিলে জবরদস্তি ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টায় বহু মানুষের জীবনাবসান- তার কোনটাই কি কেউ আগে থেকে প্রতিরোধ করতে পেরেছে, নাকি জানতে পেরেছে? এ তো গেল শুধু এই দুই দেশের কথা, এ ভিন্ন আরো কত অনাসৃষ্টি ঘটে চলেছে সারা জগত জুড়ে। একি ঘোর কলির শেষাঙ্গ? আশা করি যেন তাই-ই হয়। আগামী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ কেমন হবে সে ভাবনা আমার জন্য নয়, কিন্তু তবু আমার পরের বহু প্রজন্মের কথা চিন্তা করে কামনা করি তাদের পথ যেন সুগম হয়।

এই পৃথিবীর অসুন্দরতার পাশাপাশি যে অগাধ সুন্দরতা আছে তা অস্বীকার করি কেমন করে! প্রকৃতি, জীব, জড় পদার্থ সবই সুন্দরের প্রকাশ, সবকিছুরই একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সত্তা আছে এবং তার প্রয়োজনও আছে। আর অসুন্দর ছিল বলেই তো আমরা সুন্দরকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে পারি!

এত শোরগোলের মাঝেও বলি ভাগ্যিস আমাদের সেই আদিম পূর্বসূরী আদম আর ইভ নিষিদ্ধ আপেল খেয়েছিলেন তাই

না আমদের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব! তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রাখি।

••••❋••••❋••••❋••••

'রবীন্দ্র সেতু', আগের নাম ছিল 'হাওড়া ব্রিজ্'। সেতুটি হুগলি নদীর উপর কলকাতা আর হাওড়ার সংযোগ রক্ষা করছে। ১৮৭৪ সালে প্রথম এই হাওড়া সেতু তৈরী হয় পরে ১৯৪৩ সালে পুরনো সেতুটির বদলে বর্তমান ক্যান্টিলিভার সেতুটির উদ্বোধন হয়। 'ক্লীভল্যান্ড ব্রিজ্ অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি'এই সেতুটির নির্মাণ কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৬৫ সালে হাওড়া ব্রিজ্ নামটি বদলে নতুন নামকরণ হয় 'রবীন্দ্র সেতু'।

'বিবেকানন্দ সেতু', আগেকার নাম উইলিংডন্ ব্রিজ্ বা বালী ব্রিজ্। এই সেতুটিও হুগলি নদীর উপর, যেটি হাওড়া, বালী ও দক্ষিণেশ্বরকে যুক্ত করছে। ১৯৩২ সাল থেকে এই সেতুটি ব্যবহার করা শুরু হয়। এটি একটি মাল্টি স্প্যান্ স্টিল্ ব্রিজ্। এটি কলকাতা বন্দর আর পশ্চাদভূমির অন্যতম প্রধান রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ সেতু। সেতুটি তৈরী করেছিলেন বিখ্যাত কন্ট্র্যাক্টর ও শিল্পপতি রায়বাহাদুর জগমল রাজা চৌহান। তাঁর নামের ফলক রয়েছে সেতুটির গায়ে।

'বিদ্যাসাগর সেতু' বা **দ্বিতীয় হুগলি সেতু**। এটিও হুগলি নদীর উপর অবস্থিত এবং এই সেতুটিও হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে। এটি একটি 'টোল্' সেতু। এটি ভারতের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু। সেতুটি নির্মাণ করে 'গ্যামন্ ইন্ডিয়া লিমিটেড্'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তিতে ১০ই অক্টোবর, ১৯৯২ সালে সেতুটির উদ্বোধন হয়।

বিদায়

পুষ্পা সাক্সেনা
অনুবাদ: সুজয় দত্ত

ফোনের অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটা শুনেই শ্যামলীর মুখে একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল। কোনোরকমে নিজেকে সংযত রেখে জবাব দিল, 'ম্যাডাম, আজ তো যাওয়া একটু মুশকিল, কলকাতা থেকে হঠাৎ কয়েকজন অতিথি এসেছেন...। না না, ওঁরা আজকেই চলে যাচ্ছেন না, দুতিন দিন থাকবেন। তারপর আমি ঠিক পৌঁছে যাব আপনার ওখানে। প্রিয়ার জন্য আমার সবসময়ই চিন্তা রয়েছে। কেমন আছে ও? আমি আবার খোঁজ নেব...।'

ফোন রেখে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মোছে ও। মাধবী এতক্ষণ শুনছিল, এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, আজ আমাদের এখানে কলকাতা থেকে গেস্ট আসছে? কই, বলনি তো?'

'আরে দূর! এছাড়া কোনো অজুহাত মাথায় এল না। নাহলে এক্ষুণি আবার ছুটতে হ'ত। রোজ রোজ ঐ মেয়েটার পাশে ঠায় বসে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনদিন আমিও ওর মত পঙ্গু হয়ে যাব।'

'কিন্তু দিদি, আগে তো তুমি ওখানে যাবার জন্য মুখিয়ে থাকতে।'

'ধ্যাত্তেরি, তুই বুঝবি না। যাকগে, শোন, আবার যদি ম্যাডামের ফোন আসে, বলবি আমি গেস্টদের সঙ্গে কোথাও গেছি।'

'শুধু শুধু মিথ্যে বলব?'

'আরে বাবা, আজ আমার অন্য জায়গায় জরুরী কাজ আছে, সেইজন্য।'

'জানি, জরুরী কাজ মানে তো অবিনাশদার সঙ্গে কেনাকাটা করতে যাওয়া।'

'দেখ মাধবী, তুই আজকাল খুব মুখে মুখে তর্ক করা শিখেছিস। এক সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা, যা ঘরে গিয়ে পড়তে বোস!' কথা শেষ করেই শ্যামলী দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। আসলে আজ সকালেই অবিনাশের ফোন এসেছিল। সিটি সেন্টারের মাল্টিপ্লেক্স হলটায় আজ থেকে ব্যান্ডিট্ কুইন্ ছবিটা এসেছে। দুজনে একসঙ্গে দেখতে যাবে। স্কুটার নিয়ে অবিনাশ এসে পড়ল বলে ওকে নিয়ে যেতে। চুল বাঁধতে বাঁধতে শ্যামলী ভাবতে থাকে, ছোট বোনটাকে বকুনি দিল বটে, কিন্তু ও কী খুব ভুল বলেছে? যার ফোন পেয়ে ও বিরক্ত হচ্ছিল, সেই মিসেস্ জন্সনের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল আচমকাই। স্থানীয় উইমেন্স ক্লাব দুঃস্থদের সাহায্যার্থে একটা হস্তশিল্পের মেলার আয়োজন করেছিল। সেখানে উনি হাজির হয়েছিলেন ওঁর মেয়ে প্রিয়াকে নিয়ে। মেলায় কলেজ ছাত্রীরা ভলান্টিয়ার হয়ে সামলাচ্ছিল সবকিছু। শ্যামলী তখন বি. এ. পাস করে বাড়ীতে বসে। কাজকর্ম নেই। সেও গিয়েছিল ভলান্টিয়ার হয়ে, টিকিট কাউন্টারে বসে ডিউটি দিচ্ছিল। হুইল্ চেয়ারে চেপে প্রিয়া যখন সেই কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল, শ্যামলীর মনটা মুহূর্তের জন্য করুণায় ভিজে গিয়েছিল। ইস্, এই বয়সে মেয়েরা তো সব পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, আর এ বেচারা প্রতিবন্ধী হয়ে হুইল্

চেয়ারে? কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল শ্যামলী, 'তুমি কী নেবে? পাপড়ি চাট্ না গুলাবজামুন?'
উত্তরে ওর দিকে শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল প্রিয়া, কোনো কথা বলেনি।
'তাড়াতাড়ি বলো প্লীজ্।'
প্রিয়ার মুখ থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি বেরিয়েছিল, আর কষ থেকে লালা ঝরে পড়েছিল। কী বলতে চায় বোঝা যায়নি। সস্নেহে ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের লালাটা মুছিয়ে দিয়ে মিসেস্ জন্সন্ বলেছিলেন, 'থ্যাংক্স্, একটা গুলাবজামুনই দিন।' গুলাবজামুনের প্লেট এনে দিতেই অতি যত্নে ছোট ছোট টুকরো করে প্রিয়ার মুখে চামচ দিয়ে খাওয়াতে লাগলেন তিনি। কয়েকটা টুকরো মুখে না ঢুকে পড়ল ওর ফ্রকের ওপর। একটু ছটফট করে উঠল মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপ্‌কিন্ দিয়ে মুছে দিলেন মিসেস্ জন্সন্। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখে জল এসে গিয়েছিল শ্যামলীর। জানতে চেয়েছিল, 'ম্যাডাম্, কী করে এমন হল?'
'আমার দুর্ভাগ্য। আর কী বলব!'
'এর কি কোনো চিকিৎসা নেই?'
'এক ভগবানের হাত ছাড়া এ জিনিস সারার নয়। তিনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন।'
'না না, এরকম বলছেন কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'
'সত্যিই যদি তাই হ'ত! তোমার নাম কী মা?'
'শ্যামলী। আমি এই কাছাকাছিই থাকি। আমিও ভগবানের দেওয়া শাস্তি ভোগ করছি বলতে পারেন। হঠাৎ এক বাস দুর্ঘটনায় বাবা-মা দুজনেই চলে গেলেন। এখন আমরা শুধু দু-বোন। একটা চাকরি খুঁজছি।'
'ও মাই পুওর চাইল্ড। যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি। আমার এই মেয়েকে সঙ্গ দেবার জন্য আমি একজনকে রাখতে চাই। পয়সাকড়ি ভালই দেব। তোমার মতো কাউকে পেলে মনে হয় ওর ভালই সময় কাটবে। ওকে আর কিছু করাতে হবে না তোমায়... তার জন্য আয়া আছে। শুধু ওর সঙ্গে একটু কথা বলবে, যাতে ও একাকী বোধ না করে।'
'এ তো আমার সৌভাগ্য, ম্যাডাম্। আমি যদি প্রিয়ার কোনো কাজে লাগি, আমার জীবন সার্থক মনে করব।'
দুদিন বাদেই ও মিসেস্ জন্সনের বাংলোয় হাজির। বড়সড় বাংলো, চারিধারে বড় বড় গাছ, সামনে বিরাট লন্। দেখ-ভাল করে না কেউ, তাই অযত্নে পড়ে আছে। তবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে একসময় এই প্রাসাদোপম বাংলো লোকজনের যাতায়াতে সরগরম ছিল। এখন তো দরজায় লাগানো নেম্ প্লেটেও ধুলো পড়ে আছে।
পরিচারক মারফৎ ওর নাম শুনেই বেরিয়ে এলেন মিসেস্ জন্সন্।
'আরে এসো এসো। আমি তো ভাবছিলাম তুমি আর এলেই না।'
'ওমা, এরকম ভাবলেন কেন?'
'একটা জীবিত মৃতদেহের সঙ্গে সময় কাটানো তো সোজা নয়, তাই।'
'এসব কী বলছেন কী ম্যাডাম?' শিউরে উঠে বলেছিল শ্যামলী।
'ঠিকই বলছি মা। আমি তো প্রিয়ার মা, আমিই ক্ষণে ক্ষণে ওর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাই। কে জানে কখন মৃত্যু এসে ওকে ছিনিয়ে নেবে, আর আমি পড়ে থাকব এই শূন্যতায়।' কেঁপে ওঠে মিসেস্ জন্সনের গলার স্বর।
'প্রিয়ার ঠিক কী হয়েছে বলুন তো?'
'এক ধরনের মাস্কিউলার ডিস্ট্রফি। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পড়ছে আর আমার পরীর মতো উড়ে বেড়ানো ফুটফুটে মেয়েটা অবশ শরীর নিয়ে এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিক দিয়ে ভাল যে ওর বাবাকে এ জিনিস দেখার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি... তিনি আগেই চলে গেছেন।'
'হায় ভগবান, এই ছোট্ট মেয়েটাকে এত বড় সাজা!'
'জানো শ্যামলী, যেদিন ওর পা দুটো আর কাজ করল না, ও দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলল, আমি খুব কেঁদেছিলাম। তখন ঐটুকু মেয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, মা, পৃথিবীতে আরো কত লোকের পা নেই বলো তো? আমার হাতদুটো তো এখনো আছে। দেখে নিও, ওদুটো দিয়ে আমি কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকব, কবিতা লিখব। তাতেই আমার সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে, বুঝতেও পারবে না। ও কিন্তু প্রথম প্রথম সত্যিই তাই করত। ওর আঁকা ছবিগুলো দেখো, তাতে আকাশে ডানা মেলা পাখী, ফুলে ফুলে মধু খেতে থাকা রংবেরঙের প্রজাপতি... এইসব আছে। ওর কবিতাগুলোয় বেঁচে থাকার এক অদ্ভুত আর্তি ঝরে পড়ত। কিন্তু গত এক বছর ধরে ওর হাতও আর কাজ করে না। মুখ দিয়ে কথা বেরোনোও বন্ধ হয়ে গেল এই কিছুদিন আগে। ওঃ, আমি আর সহ্য করতে পারি না।'
চোখে রুমাল চেপে মিসেস্ জন্সন্ সরে গিয়েছিলেন সামনে থেকে। আর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যত মায়া, যত মমতা সব উথলে উঠেছিল শ্যামলীর ঐ হতভাগ্য মেয়েটার জন্য। নিঃশব্দে মিসেস্ জন্সনের পিঠে সান্ত্বনার হাত রেখে ও মনে মনে শপথ নিয়েছিল, যতদিন ওর ক্ষমতায় কুলোবে ঐ মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটার জীবনকে সুন্দর করে তোলার কাজে ও মনপ্রাণ ঢেলে দেবে।

গোড়ার দিকে প্রিয়ার গোঙানির মতো কথা বুঝতে ওর অসুবিধে হ'ত। কিন্তু আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়তে লাগল। প্রিয়ার হাতদুটো কাজ না করলেও হাতের আঙুলগুলো তখনও অকেজো হয়ে যায়নি। ওর হাতটা নিয়ে আলতো করে মেঝেতে সাদা কাগজের ওপর রেখে আঙুলে রংপেন্সিল ধরিয়ে দিত শ্যামলী। তাতে আঁকাবাঁকা রেখা আঁকত মেয়েটা। শ্যামলী ধরে ধরে সাহায্য করত, যেন ওর ড্রইং টিচার। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে ঐ অর্থহীন রেখাগুলোর মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে কিছু অর্থপূর্ণ ছবি বেরোতে শুরু করল। বড় বড় গাছের ঝাড়, তাতে অজানা সব ফুল ফুটে আছে, তার পিছনে সূর্য ডুবছে কমলা-লাল রং ছড়িয়ে... এই ছবিটার ওপর কালো পেন দিয়ে অতি কষ্টে প্রিয়া লিখেছিল 'অবসান'। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শ্যামলী। না না, অবসান নয়, এই অসহায় মেয়েটার জীবনে এইভাবে অবসান নেমে আসতে দেবে না ও। সেইদিন থেকে প্রিয়াকে ও ভাল ভাল গল্পের আর কবিতার বই পড়ে শোনাতে শুরু করল। সেগুলো শুনে মেয়েটার মনে যে অব্যক্ত আবেগের ঢেউ খেলত, তা যেন ওর চেহারায় আভা হয়ে ফুটে

উঠত। একদিন তো একটা গল্পের নামকরণ খুব পছন্দ হওয়ায় অস্পষ্ট ভাষায় বলেই উঠল, 'টাই...টেল্...টা... দা...রুণ'।

এইভাবেই প্রতিবন্ধী মেয়েটাকে নিয়ে কেটে যাচ্ছিল শ্যামলীর দিন। ওর ঐকান্তিক চেষ্টা আর আন্তরিকতা মিসেস্ জন্সনকে যেন নতুন জীবন দিয়েছিল। মেয়ের মুখে এক নতুন জৌলুস দেখে মনে মনে হয়ত অবুঝ আশার জাল বুনতে শুরু করেছিলেন তিনি। নাহলে শহরের বড় বড় ডাক্তাররা তো সেই কবেই বলে দিয়েছেন এ রোগ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, তাই মিথ্যে আশা করে লাভ নেই। যাই হোক, ওঁর বাড়ীতে শ্যামলী যতক্ষণ থাকত, তার যত্ন-আত্তির এতটুকু ত্রুটী হতে দিতেন না মিসেস্ জন্সন্। নিত্যনতুন রান্না করে খাওয়ানো, কথায় কথায় উপহার দেওয়া, মাস গেলে সাড়ে চারহাজার টাকা মাইনে... এত কিছুর পরও যেন তাঁর মনে হত যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করা হচ্ছে না। কথায় কথায় একদিন শ্যামলী আরো একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারল। শহরের সবচেয়ে নামকরা উকিলের একমাত্র মেয়ে মর্জিনা খাতুনের কাছে বিয়ের লোভনীয় প্রস্তাব কম আসেনি, কিন্তু একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আর্কিটেক্টের প্রেমে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। রবার্ট জন্সন্। শেষে তাঁকেই বাছেন জীবনসঙ্গী হিসেবে। স্ত্রীর ছেলেবেলা যেমন ঐশ্বর্য্যে আর আদর যত্নে কেটেছে, তার বিবাহিত জীবনেও তাকে সেইরকম প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধির মধ্যেই রেখেছিলেন রবার্ট সাহেব। মেয়ে প্রিয়ার জন্ম ছিল দুজনের জীবনে এক অনির্বচনীয় সুখের মুহূর্ত। হাঁটতে শিখল যখন, লেস্ লাগানো ফ্রক পরে এক ঘর থেকে আর এক ঘর টলমল পায়ে ছুটে ছুটে যেত। রবার্টের কাছে মেয়ে ছিল তাঁর স্বপ্নের সাকার রূপ। কিন্তু বিধির বিধান খন্ডাবে কে? স্ত্রী-মেয়ে ছাড়াও রবার্টের জীবনে একটা তৃতীয় ভালবাসা ছিল... মোটর রেসিং। সেটাই কাল হল। এক রেসিং টুর্নামেন্টে রবার্টের গাড়ীকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর গাড়ী। চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে হেরে গেলেন তিনি। আর ভেতরে ভেতরে চুরমার হয়ে গেলেন মিসেস্ জন্সন্।

তবু তিনি সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে, শুধু মেয়েটার মুখ চেয়ে। তাঁর যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল সেই ফুটফুটে মেয়ে। হঠাৎ একদিন স্কুলের স্পোর্টসে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সে বাড়ী ফিরল দুপায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। বাড়ীর তেলমালিশ থেকে পাড়ার ডাক্তারের ওষুধ... কিছুতেই যখন কাজ হল না, উনি ওকে নিয়ে গেলেন স্পেশ্যালিস্টের কাছে। সেখানে যা শুনলেন, তাতে উনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। চোখের সামনে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা মেয়েটাকে এবার মৃত্যুর কালো ছায়া এসে গ্রাস করে নেবে? কিছু করার নেই... কিচ্ছু না? এই তাহলে ছিল ওর নিয়তি? এই যন্ত্রণা ভুলতে তিনি মুঠো মুঠো ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করলেন। যতক্ষণ জেগে থাকতেন, দুচোখ দিয়ে শুধু অঝোর ধারায় জল পড়ত। আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এইসময় তাঁকে সান্ত্বনা দিত ক্লাস টেনের ছাত্রী প্রিয়া! এমন নয় যে সে জানত না তার আসলে কী হয়েছে। একদিন আড়াল থেকে ডাক্তারের সঙ্গে মাকে ফোনে কথা বলতে শুনেছিল ও। আর জানা সত্ত্বেও ঐটুকু মেয়ের কী মনের জোর! বলত, 'মা, তুমি তাদের কথা একবার ভাব যাদের ওষুধ কেনারও পয়সা নেই। তাদের ঘরে যদি এই রোগ হ'ত? কী করত তারা? ওদের চেয়ে তো আমরা অনেক ভাল অবস্থায় আছি'। মেয়ের মুখে একথা শোনার পর নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন মিসেস্ জন্সন্। ওর সামনে আর কান্নাকাটি করতেন না। আর মেয়ে নিজের অসুখ নিয়ে নিজেই গবেষণায় ডুবে গেল, একের পর এক বই পড়তে শুরু করল। মা বারণ করলে বলত, 'আচ্ছা, আমি না পড়লেই কি যা সত্যি সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে? সত্যিকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করাই তো ভালো। মৃত্যুকে আমি থোড়াই ভয় পাই। দেখো না, কালকেই একটা কবিতা লিখেছি'। মা দেখতেন, সে-কবিতায় আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই। বরং রয়েছে অজানা মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র অপেক্ষা। কিন্তু হঠাৎই কোনো কোনো পঙ্ক্তিতে ঝলকে উঠত বাঁচার উদগ্র ইচ্ছে।

'মৃত্যু, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার অপেক্ষায়।
কিন্তু তোমায় দেখিনি, তাই চিনব না যে হায়।
শুধু আমার মায়ের চোখে দেখছি তোমার ছায়া...
কবে এসে ছিনিয়ে নেবে জীর্ণ এ মোর কায়া?
আচ্ছা, আমায় আর কটা দিন বাঁচতে দেবে ভাই?
মা যে আমার একলা বড়, কষ্ট লাগে তাই।'

শুনতে শুনতে শ্যামলীর চোখ জলে ভরে এসেছিল। মায়ের সামনে যতই সাহস দেখাক, মেয়েটা নিশ্চয়ই নিজের অসুখের কথা জানার পর অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। সেসব কথা হয়ত মিসেস্ জন্সন্ও জানেন না।

একদিন ওদের বাড়ীতে যেতেই শ্যামলী খবর পেল, মিসেস্ জন্সন্ তাঁর জানাশোনা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে বলে-কয়ে ওর রিসেপ্‌শনিস্টের চাকরি করে দিয়েছেন। শুনে ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতাভারে নুয়ে পড়ল ও। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা অবধি ডিউটি ওখানে। শেষ হলেই ও ছুটে চলে আসত প্রিয়ার কাছে। প্রিয়াও ওর জন্য অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকত, এলেই তার চোখে লাগত খুশীর ঝিলিক।

কিন্তু মাস দুয়েক আগে ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে ঐ কোম্পানীরই এক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয় শ্যামলীর। নাম অবিনাশ ভার্গব। আলাপ দ্রুত গড়াল বন্ধুত্বে আর বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায়। অবিনাশের সান্নিধ্য শ্যামলীর মনে অনেক রঙীন স্বপ্ন ছড়াত। প্রেম এমনই জিনিস! কিছুদিন বাদে দেখা গেল ছুটির পর একটার সময় প্রিয়ার কাছে যাবার কথা ভাবলে ওর বিরক্তি আসছে। নানা অজুহাতে প্রিয়াকে এড়িয়ে যেতে শুরু করল ও। মিসেস্ জন্সন্ বুঝতেন সবই, তবে কখনো কিছু বলতেন না। কিন্তু অবিনাশ যত ওর মন জুড়ে প্রভাব বিস্তার করে, প্রিয়ার কথা ততই শ্যামলীর মন থেকে মুছে যায়। মাঝে মাঝে ও যখন দু-তিনদিন অনুপস্থিতির পর গিয়ে দাঁড়াত প্রিয়ার শয্যাপার্শ্বে, মেয়েটার চোখে বিষাদের ছায়া দেখেও ও না দেখার ভান করত। তাড়াহুড়ো করে কিছু গল্প আর কবিতা শুনিয়ে ক্লান্তির অজুহাতে বাড়ী পালিয়ে আসত।

আজ সকালেও সেই একই ব্যাপার। গত দুদিন শ্যামলী

প্রিয়ার কাছে যায়নি, তাই মিসেস্ জন্সন্ ফোন করলেন আর ও কলকাতা থেকে অতিথি এসেছে বলে এড়িয়ে গেল। তবে আজ ফোনে মিসেস্ জন্সন্ বলছিলেন একটা কথা, যা অন্যদিন বলেন না। বলছিলেন, 'প্রিয়াকে আজ সকাল থেকেই কেমন একটা অন্যরকম লাগছে, যেন সবকিছু ঠিকঠাক নেই। তুমি যদি আসো, হয়ত ওর একটু ভালো লাগবে'। তাছাড়া গত কয়েকদিন ধরে ছোটবোন মাধবীও নাছোড়বান্দার মতো ওর পিছনে লেগে রয়েছে, 'দিদি তুমি প্রিয়ার কাছে যাওয়া বন্ধই করে দিলে একেবারে? আগে তো কখনো এরকম করতে না...'

'আমার নিজের বুঝি কোনো জীবন থাকতে নেই? ঐ মেয়েটার পাশে ঠায় বসে থাকা আর একটা শ্মশানযাত্রী মড়ার খাটের পাশে বসে থাকা তো একই জিনিস'... ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল শ্যামলী।

'ছিঃ দিদি! আজ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেটা মিসেস্ জন্সন্ ছাড়া সম্ভব হত? এত অকৃতজ্ঞ তুমি?'

'ঐ ভদ্রমহিলার ঋণ শুধতে গিয়ে কি আমি ওঁর মেয়ের মতোই একটা জীবিত মৃতদেহ হয়ে যাব? আমিও তো ওদের জন্য কম করিনি। কটা লোক করবে ওরকম? তুইই বল, আমার আগে মিসেস্ জন্সনের এই চাকরিতে আর কেউ এতদিন টিকেছে?'

অন্যদিন এইসব বলে বোনকে চুপ করিয়ে শ্যামলী অবিনাশের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে যায়। আর মনে মনে নিজেকে জাস্টিফাই করতে থাকে... না, ও মোটেই ভুল কিছু করেনি। ঐরকম একটা নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ মেয়ের পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কাটানো আর কারুর পক্ষে কি আদৌ সম্ভব হ'ত? মেয়েটার পিছনে এত সময় দিয়ে ও মিসেস্ জন্সনের কত বড় উপকার করেছে, সেকথা তো কেউ বলছে না! একটা যুবতী মেয়ের যে নিজের জীবন বলে একটা বস্তু আছে, সেটা ঐ ভদ্রমহিলার বোঝা উচিত। আর জীবন তো একটাই। সেটা ও এভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে দেবে? সুতরাং কলকাতা থেকে অতিথি আসার অজুহাত খাড়া করে আর বোনকে মিথ্যেটা ভাল করে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে ও অবিনাশের সঙ্গে দুদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে গেল। অবিনাশ বলল, 'আরে ছাড়ো তো! মিসেস্ জন্সন্ এটাকে মিথ্যে বলে সন্দেহ করলেও কিছুই বলবেন না। উনি কি মনে মনে তোমার প্রতি কম কৃতজ্ঞ নাকি?'

দুদিন পর খুশীতে উচ্ছল হয়ে বাড়ীতে পা দিয়েই শ্যামলী দেখল গম্ভীর মুখে মাধবী দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত স্বরে দিদিকে বলল, 'অভিনন্দন। সুখবর আছে তোমার জন্য। আজ থেকে তুমি একেবারে মুক্ত।'

'মানে?' চমকে উঠে জানতে চায় শ্যামলী। তারপর হঠাৎই যেন সবকিছু বুঝতে পেরে আর্তনাদ করে ওঠে, 'কী বলছিস কী? না... না ... এ হতে পারে না... এ হতে পারে না।'

'ওর শেষ সময়ে মিসেস্ জন্সন্ অনেকবার তোমার খোঁজ করেছিলেন। তুমি যাবার আগে সেদিন সকালেও তো বললেন তোমাকে, ওর অবস্থা ভাল ঠেকছে না। কিন্তু কী করা যাবে, তুমি তোমার সম্মানিত অতিথিদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত ছিলে, তাই যেতে পারোনি।' মাধবীর স্বরে শ্লেষ ঝরে পড়ে। কিন্তু শ্যামলীর তখন ওসব শোনার মতো অবস্থা নেই। একটা কাটা গাছের মতো ধপ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও।

অনেকক্ষণ বাদে, অনেক কষ্টে শক্তি সঞ্চয় করে শ্যামলী মিসেস্ জন্সনের বাড়ী পৌঁছল। প্রিয়ার শূন্য ঘরে কালো পোশাক পরে বসেছিলেন তিনি। চেহারা এমন হয়ে গেছে যে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। দুদিনেই যেন বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। শ্যামলীর পদশব্দ পেয়ে ওর দিকে তাকালেন যখন, ভেতরে জমে থাকা শোক আর বাঁধ মানল না। ওঁর কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলী। কোনো সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ ওর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। মিসেস্ জন্সন্ই চোখের জল সামলে প্রথম কথা বললেন, 'ওর অন্তিম সময়ে ওর এতবড় একজন বন্ধু কাছে ছিল না। না জানি কত একা লেগেছে বেচারার।'

'আই অ্যাম্ সো সরি, মিসেস্ জন্সন্। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে...'

'না না মা, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি তো ওকে অনেক সময় দিয়েছ। ও কত এন্জয় করেছে। আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, আমার মেয়েও সত্যি সত্যিই তোমায় ভালবাসত। জানো, চলে যাবার আগে ও তোমার জন্য একটা জন্মদিনের কার্ড বানাচ্ছিল। শেষ করে যেতে পারেনি, কিন্তু কী একটা যেন লিখে গেছে...'

আস্তে আস্তে উঠে মিসেস্ জন্সন্ প্রিয়ার টেবিল থেকে একটা ছবি-আঁকা কার্ড আর একটা নীল কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দেন। সেই কাগজে অনেক কষ্ট করে লিখে যাওয়া কিছু শব্দ...

'আমার বিদায়ের দিন ফুলের স্তবক এনো না তোমরা। হাসিখুশী ফুলগুলোকে কাঁদাতে আমার ভালো লাগে না'।

আর কার্ডে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা...

'অল্ দ্য বেস্ট, শ্যামলীদি...'

হিউস্টনে পাঠচক্রের সাহিত্য সভা অধিবেশন ২০১৪

এপ্রিল মাসে চন্দ্রা ও রবি দে-র বাড়িতে নববর্ষের ভোজসভা

এপ্রিল মাসে চন্দ্রা ও রবি দে-র বাড়িতে নববর্ষের ভোজসভা

মে মাসে ইলা ও সুভাষ দাস-এর বাড়িতে জমায়েত

মে মাসে ইলা ও সুভাষ দাস-এর বাড়িতে জমায়েত

জুন মাসে রূপছন্দা ও অচিন্ত্য ঘোষ-এর বাড়িতে সাহিত্য সভা

জুন মাসে রূপছন্দা ও অচিন্ত্য ঘোষ-এর বাড়িতে সাহিত্য সভা

অগাস্ট মাসে সুমিতা ও সোমনাথ বসু-র বাড়িতে সাহিত্য সভার অধিবেশনে
মৃণাল চৌধুরীর একটি নতুন বই, 'কিছু ভাবনা ও কিছু গল্প' প্রকাশিত হ'ল।
সভায় যোগদান করেছিলেন বিশেষ অতিথি লেখিকা চিত্রা ব্যানার্জী।

কলকাতা বইমেলার কাউন্টডাউন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন। আর মাত্র তিন সপ্তাহের অপেক্ষা। ২০১৪-র আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিবারের মতো এবারেও মিলনমেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে ৩৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা। মুক্তধারা বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনে এই পুস্তকমেলা উপলক্ষে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিক বৈঠকে ১২ দিন ব্যাপী এই পুস্তকমেলার খুঁটিনাটি জানানো হল। আগামী ২৮ জানুয়ারি ৩৮তম আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলার উদ্বোধন হবে। এবং এ বছরের পুস্তকমেলার মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকতে চলেছে পেরু। অর্থাৎ পেরুই হচ্ছে এবারের পুস্তকমেলার থিম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন পেরুর স্বনামধন্য সাহিত্যিক রোডলফো হিনস্ট্রোজা ক্রুজেন এবং বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। দূর দূরান্তে থাকা পুস্তকপ্রেমীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি বিশেষ ইন্টারনেট ওয়েবসাইট পরিষেবার। রেজিস্ট্রেশনের মারফত যে কেউ এই ওয়েবসাইটের সদস্য হতে পারবেন। এবং একটি বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে অনলাইন বই কেনার ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ শতাংশ ছাড়ের সুবিধাও পাবেন। এছাড়াও ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিউবের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের বইপ্রেমীরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন পুস্তকমেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এর পাশাপাশি রয়েছে আপনাদের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার মতো সুবর্ণ সুযোগ। ৫০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের বই কেনার ওপর রয়েছে একটি বিশেষ কুপন। সেই কুপনগুলি থেকে প্রতিদিন দু'বার লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে একজনকে। আবার লাকি বিজেতাদের জন্য রয়েছে ৫০০০ টাকার গিফট কুপন। এছাড়াও আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার রয়েছে বইপ্রেমীদের জন্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে (বাঁদিক থেকে) ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, পেরুর সাহিত্যিক রোডলফো হিনস্ট্রোজা ক্রুজেন ও সুধাংশু দে। নিজস্ব ছবি

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

১৪২১ (2014)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা অথবা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি পাঠান নিম্নলিখিত ঠিকানায়।
যদি আপনারা টাইপ করে লেখা পাঠাতে চান, তাহলে 'আমার বাংলা' ফন্ট ব্যবহার করুন।
আমার বাংলা ফন্টে টাইপ করা লেখা ওয়ার্ড বা বাংলা ওয়ার্ড ফরম্যাটে পাঠান (পিডিএফ্ নয়)।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479

e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321

e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২০ ডলার।
বর্তমানে প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা সাহিত্যের বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে,
যেগুলি সভ্যরা পছন্দমত ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401

Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com